চম্পাবাঈ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৫৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

বর্তমান কাহিনীর মূল সূত্রটি আমার প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক বন্ধুবর হরিদাস ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শোনা—

লেখক

উল্কা
২৬এ গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা ১৯

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

ক্যামোলয়া

ভেনডেটো

সূর্যমহল

ছায়াসঙ্গিনী

কালোছায়া

রুক্মিণীবাঈ

শহর কলকাতারই বিশিষ্ট অভিজাত পল্লী।

কিড্ স্ট্রীট অঞ্চল।

কিড্ স্ট্রীট ধরে কিছুটা উত্তরমুখী এগুলে একেবারে বড় রাস্তার উপরেই বাড়িটা।

পুরাতন আমলের স্ট্রাকচার—বনেদী কলকাতার ধনীর গৃহ। লাল রংয়ের তিনতলা বাড়ি।

ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করতে হলে, তা সে গাড়িতেই হোক বা পদব্রজেই হোক, বাড়িটা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

বিরাট দোপাল্লার লোহার গেট।

গেটের দুই পাল্লার ঠিক মধ্যস্থলে হৃদ্‌পিণ্ডের মত গোলাকৃতি ঝকঝকে পিতলের ফলকে এক দিকে ব্রোঞ্জের অক্ষরে ইংরেজি 'এন', অন্য দিকে বাংলা অক্ষরে 'নী' লেখা।

অর্থাৎ নীলাদ্রি চৌধুরীর নামের আদ্যক্ষর ইংরেজি ও বাংলার 'এন' বা 'নী'।

অবিশ্যি গেটের গায়ে দু'পাশে নেম প্লেটে ইংরেজি ও বাংলায় সম্পূর্ণ পরিচয় লেখা আছে। ইংরেজিতে এন. চৌধুরী এম. এ. (অক্সন.) বার-অ্যাট-ল ও বাংলায় নীলাদ্রি চৌধুরী কেবল।

গেট দিয়ে ঢুকেই নুড়িঢালা চওড়া রাস্তা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে গোলকৃতিভাবে একটা ফোয়ারাকে বেষ্টন করে যেন দু'বাহু বাড়িয়ে পোর্টিকোতে গিয়ে মিশেছে।

এক পাশে প্রশস্ত সবুজ মখমলের মত লন, অন্য দিকে শীতের মৌসুমী ফুলের অজস্র রঙিন সমারোহ।

পোর্টিকোতে খান দুই বড় বড় গাড়ি পাশাপাশি পার্ক করতে পারে অনায়াসেই।

পোর্টিকোর সামনে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ের মধ্যস্থলে সম্পূর্ণ নগ্ন যৌবনোচ্ছল এক শ্বেত পাথরের নারীমূর্তি।

পোর্টিকো থেকে অন্দরে পা দিলেই প্রশস্ত আধুনিক আসবাবে সজ্জিত একটি হলঘর।

হলঘরের এক দিকে লাইব্রেরী—

অন্য দিকে পাশাপাশি দুটো ঘরে একটায় নীলাদ্রি চৌধুরীর অফিস, অন্যটা তার বিশেষ পরামর্শ বা বিশ্রাম ঘর।

গেটের নেম প্লেটে নীলাদ্রি চৌধুরীর পরিচয় বার-অ্যাট-ল থাকলেও তার আরো অন্য পরিচয় আছে শহরে, অন্যতম ধনী বিরাট ব্যবসায়ী—ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট একজন।

ব্যারিস্টার নীলাদ্রি চৌধুরী যে শহরে একজন নামকরা বাঘা ব্যারিস্টার ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট তাই নয়—তার অন্য পরিচয়ও একটা আরো আছে। শহরের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবীও বটে। বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেমন সে জড়িত তেমনি সমাজের উঁচু মহলে রীতিমত প্রতিপত্তি তার।

এককথায় শহরের অন্যতম বিশিষ্ট একজন ধনী ব্যক্তি হিসাবে ধনিক সমাজেও শহরের সে একজন চিহ্নিত ব্যক্তি।

আট-দশটা বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মালিক বা অধিকর্তা—নিজের ব্যবসা কোল মাইন্‌স ও টি এসটেট্‌ ছাড়াও নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে নানাভাবে জড়িত, চেয়ারম্যান-ডাইরেকটার ইত্যাদি।

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি থাকলে যা হয়। নানা ক্লাব ও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের পেট্রন, প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বার।

লোকটার দান-ধ্যানও কম নয়।

মানুষটার সর্ব ব্যাপারে যেন একটা প্রতিষ্ঠার, আত্মপ্রত্যয়ের, আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ।

অর্থাৎ নীলাদ্রি চৌধুরী আজকের সমাজের সর্বস্তরে বিশেষ এক চিহ্নিত ব্যক্তি।

বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। কিন্তু আজো অবিবাহিত।

দোহারা চেহারা।

ব্যায়ামপুষ্ট সুঠাম দেহ। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির বেশী নয়।

রংটা যদিও একটু চাপা—কপালটা সামান্য চওড়া—নাকটা একটু ছড়ানো—ঠোঁট দু'টি সামান্য মোটা, তাহলেও তার ঈষৎ কটা চুল, বেশভূষা, হাঁটা, চলা, কথাবার্তা এমন কি দাঁড়ানো ও সর্বক্ষণ চাপা

হাসিটির মধ্যে বিশেষ একটা আভিজাত্য, একটা ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট-ভাবে ফুটে বের হয়।

কপালের দু'পাশে রগের চুলে তো রুপালী ছোঁয়া লেগেছেই, মাথার অন্যান্য অংশের কেশেও অনেক জায়গায় রুপালী দাগ পড়েছে।

তবু—তবু যেন দেহের মধ্যে একটা সুসংহত যৌবন টলমল করছে, সর্বক্ষণ মনে হয়।

ইলেকশন সন্নিকটে।

লোকসভার অন্যতম প্রার্থী হিসাবেই যে শুধু নীলাদ্রি চৌধুরী দাঁড়িয়েছে, তাই নয়, সকলেই জানে, আসন্ন নির্বাচনযুদ্ধে তার জয় সুনিশ্চিত।

বোধ হয় ঐ কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে বিশিষ্ট এক সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার পরাশর মিত্র হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে নীলাদ্রি চৌধুরীর বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

আজকাল আসন্ন ইলেকশনের ব্যাপারে সর্বক্ষণই প্রায় নীলাদ্রি চৌধুরীর বাড়ির গেট খোলা থাকে—মানুষজন ও গাড়ির যাতায়াত ঘন ঘন চলে সকাল থেকে রাত আটটা-দশটা পর্যন্ত।

পরাশর মিত্র লোকটির বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে। বেশ গোলগাল চেহারা—বেঁটে।

মাথার সামনের দিকটা সবটাই টাক—চকচক করে।

পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি।

পায়ে চপ্পল।

হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ।

একবার একটু যেন ইতস্তত করে পরাশর মিত্র তারপর গেট দিয়ে ভিতরে অগ্রসর হয়—

দরোয়ান বাধা দেয় না—

আজকাল তো গেট খোলাই থাকে—সর্বক্ষণই লোকজন আসছে আর যাচ্ছে।

পরাশর মিত্র এগিয়ে চলে—

পোর্টিকো থেকে সামনের হলঘরে ঢোকে খোলা দরজাপথে।

জনা কুড়ি-পঁচিশ লোক হলঘরে—নানাবয়সী—আসন্ন ইলেকশন

ক্যামপেনের ব্যাপারেই বোধহয় আলোচনা চলেছে।

বেয়ারা ঘন ঘন চা দিচ্ছে কাপে কাপে আর প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট।

সিগারেটের ধোঁয়ায় হল-ঘরটা যেন একটা ধোঁয়া-ঘর হয়ে উঠেছে।

পরাশর মিত্র বার কয়েক এদিক ওদিক তাকাল।

একজন বেয়ারাকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকল।

বেয়ারা জিজ্ঞাসা করে, কি চাই বাবু?

এই কার্ডটা—

বেয়ারা শিবদাস প্রশ্ন করে, সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন? অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে?

না—মানে—

তাহলে তো সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না—অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে রাখা হয়েছে সেক্রেটারী দিদিমণির সঙ্গে।

তুমি নিয়ে যাও না কার্ডটা সাহেবের কাছে একবার—না দেখা হলে চলে যাবো।

অযথা চেষ্টা করছেন বাবু—সাহেব দেখা করবেন না—

যাও না একবার কার্ডটা নিয়ে—

বেশ দিন—বেয়ারা শিবদাস কার্ডটা হাতে নিল বটে, কিন্তু মুখটা প্রসন্ন মনে হলো না।

অফিসঘরের মধ্যে তখন নীলাদ্রি চৌধুরী তার পার্সোন্যাল স্টেনোকে একটা জরুরী চিঠি ডিকটেট করছিল।

পরনে পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন। সকাল আটটা হলেও বোঝা যায়, ইতিমধ্যেই নীলাদ্রির স্নান হয়ে গিয়েছে।

অদূরে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে কতকগুলো চেক লিখছিল একটি তরুণী—বয়স তার ত্রিশের নীচেই।

রোগা পাতলা চেহারা এবং রংটা উজ্জ্বল শ্যাম হলেও চেহারার মধ্যে যেন একটা পরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য আছে তরুণীটির।

তরুণীটির চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত বুদ্ধির দীপ্তি যেন স্পষ্ট। সাদামাটা পোশাক। সাধারণ একখানি তাঁতের শাড়ি, ফুল স্লিভের ব্লাউজ। এক হাতে মোটা একটা সোনার বালা, অন্য হাতে ছোট একটা সোনার ঘড়ি।

নাম তনিমা ব্যানার্জী—ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ.।

নীলাদ্রির সেক্রেটারী যদিও তনিমা ব্যানার্জী, কিন্তু কিছুদিন থেকেই নানা মহলে একটা কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই নাকি তনিমাকে বিয়ে করবে নীলাদ্রি।

চিঠিটা ডিকটেট করতে করতে নীলাদ্রি মধ্যে মধ্যে সামনেই টেবিলের উপরে রাখা অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গে ঐদিনকার বিশেষ দৈনিক 'সমাজদর্পণ'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই নীলাদ্রি চৌধুরীকে নিয়ে যে মুখরোচক সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে বিশেষ সংবাদদাতা অগ্নি মিত্র কর্তৃক, সেটার দিকে তাকাচ্ছিল আর বলছিল ঃ as per our correspondence ref. no. 699/c. etc.····your tender has been accepted—so we would request you to do accordingly etc.—চিঠিটা তাতাতাড়ি type করে আনো—আজই ডাকে যাওয়া চাই—

স্টেনো তার খাতাপত্র নিয়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তনিমা ব্যানার্জী ঐ সময় প্রশ্ন করে, হীতেন্দ্রনারায়ণ কে. জি-র ডোনেসনটা কি এই মাস থেকে বাড়ানো হবে—

হ্যাঁ --নীলাদ্রি জবাব দেয়, আরো দুশো বাড়িয়ে দাও—

অবলা আশ্রমের ডোনেসনটা—

হ্যাঁ, ওখানেও হাজার টাকা বাড়িয়ে দাও—ওদের ঘরগুলো সব মেরামত করা দরকার—

বেয়ারা শিবদাস ঐ সময় এসে পরাশর মিত্রর কার্ডটা একটা প্লেটে করে সামনে ধরল নীলাদ্রির।

কার্ডটার দিকে তাকিয়েই নীলাদ্রির ভ্রূ দুটো যেন কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

তনিমা—

কিছু বলছেন?

মানুষটার ধৃষ্টতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কার কথা বলছেন?

পরাশর মিত্র—সমাজদর্পণের রিপোর্টার—অর্থাৎ ইন্দ্র মিত্র ছদ্মনামধারী।

তনিমা ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

লোকটা কিছুদিন যাবৎ নীলাদ্রির ছিদ্রান্বেষণে যেন অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে। এবং তার লক্ষ্যটা যে কি, তাও বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়।

আসন্ন ইলেকশনের প্রার্থী নীলাদ্রি চৌধুরীকে জনগণের সামনে প্রার্থী হিসাবে একজন অনপযুক্ত ব্যক্তি প্রতিপন্ন করা।

ব্যাপারটা নিয়ে দু'জনার মধ্যে কিছু আলোচনাও হয়েছিল ইতিপূর্বে। কিন্তু নীলাদ্রি যে ব্যাপারটায় তেমন কিছু একটা গুরুত্ব দিয়েছে তাও নয়, কারণ সে ভাল করেই জানে, যে মাটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে, সেটায় ফাটল ধরার কোন আশংকাই নেই।

আজকের সংবাদপত্রেই লোকটা যে ভাবে তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে, তারপরও এখানে এসে দাঁড়াতে পারে, নীলাদ্রি ভাবতেই পারেনি।

২

শিবদাস—নীলাদ্রি ডাকে।

সাহেব—

বলে দে, দেখা হবে না—

শিবদাস ফিরে যাচ্ছিল, নীলাদ্রি আরো বলে, বলে দিবি, কখনও যেন না আসে আর এখানে—

কিন্তু বাধা দিল তনিমা, শিবদাস দাঁড়াও—

শিবদাস দাঁড়াল আবার ঘুরে।

আমার মনে হয়, লোকটা যখন এসেছে, একবার দেখা করাই ভাল আপনার।

কিন্তু—

জানি, লোকটা নোংরা ইতর—কিন্তু সামনে আপনার ইলেকশন—

নীলাদ্রি মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে—বুঝি তনিমার কথাটা অযৌক্তিক নয়, ভেবেই ইতস্তত করে—

দরজা ঠেলে ঐ সময় নীলাদ্রির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু তুষারশুভ্র সেন ঘরে এসে প্রবেশ করল।

খাঁটি দেশসেবী—এককালে বিপ্লবী দলে ছিল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়—এখন একজন নাম করা সোস্যাল ওয়ার্কার।

এবং নিজে ছোটখাটো একটা সাবানের ফ্যাক্টরি খুলেছে।

এসো, তুষারশুভ্রকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। তারপর ভৃত্য শিবদাসের দিকে ফিরে বলে, একটু পরে বাবুকে পাঠিয়ে দিস।

শিবদাস ঘাড় হেলিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

না হে নীলাদ্রি, আমার জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। কোন জরুরী ব্যাপারে কেউ এসে থাকলে—

তুষারশুভ্রকে বাধা দেয় নীলাদ্রি, জরুরী আবার কি, একটা ছুঁচো—

ছুঁচো—

ইলেকশনে নেমেছি তাই আমার আশেপাশে সর্বক্ষণ ছুঁকছুঁক করে বেড়াচ্ছে। যদি কোন ছিদ্র পায় তো বা আমার জীবনের এমন কোন যদি পাতা থাকে তো সেটা মসীলিপ্ত করে দশজনের চোখের সামনে মেলে ধরতে পারে—

তাই বুঝি?

আর কি?

কিন্তু বেচারা জানে না যে আমার মধ্যে লুকোছাপা কিছু যেমন নেই, তেমিন কে আমার এমন কি জানতে পারল, তা নিয়েও মাথাব্যথা নেই—

তুষারশুভ্র হাসে।

হাসছো কি! জীবনটা চিরদিন ষোল আনা উপভোগ করে এসেছি আজ পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতে যতদিন বাঁচবো, করে যাবো।

এবারেও তুষারশুভ্র নিঃশব্দে হাসে।

Morality আর ঐ bogus vanity আমার নেই। হাসছো কি! তোমারও অজানা নয়, তোমাদের ঐ সব কিছুতে যিনি আমায় ঐশ্বর্য ও মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স এবং অটুট স্বাস্থ্য ও সম্ভোগশক্তি দিয়েছেন—তারপর একটু স্রাগ করে বলে, well if I don't know how to utilise the same that would be none of his fault.

নীলাদ্রি চৌধুরী বরাবরই অমন স্পষ্ট খোলাখুলি কথা বলে—

যা করে বা বলে তার জন্য তার এতটুকু সংকোচ বোধ আছে, অতি বড় শত্রুতেও সে দোষ তাকে কোন দিন দিতে পারেনি।

কিন্তু তবু তুষারশুভ্র তনিমার সামনে কেমন যেন একটু নিজেকে বিব্রত বোধ করে। কারণ তনিমা তখন ঘরের মধ্যেই তার চেয়ারে বসে একটা ফাইল গুছিয়ে রাখছিল।

নীলাদ্রিকে বাধা দিয়ে তুষারশুভ্র বলে, আঃ নীলাদ্রি থাম তো। তুমি দেখছি চিরদিন একই রকম রইলে—

হাঃ হাঃ করে নীলাদ্রি হেসে ওঠে, মিস ব্যানার্জীর কথা ভাবছো — গত দু' বছরে ও আমাকে যদি যথেষ্ট চিনতে না পেরে থাকে তাহলে সেটা জানবো ওরই দুর্ভাগ্য।

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো নীলাদ্রি বললে, সে কিন্তু পূর্ববৎ কাজের মধ্যেই মগ্ন আছে দেখা গেল—মনে হলো তার কানে যেন কোন কথাই প্রবেশ করেনি।

নীলাদ্রি বলে চলে to enjoy a life is not a crime—flesh and blood got its physiological hunger. যাকগে—কেন এসেছো বল।

একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

কি বল তো ?

মানে ঐ সমাজদর্পণের নিউজ রিপোর্টার অগ্নি মিত্র সম্পর্কে—

You mean ঐ ছুঁচো—পরাশর মিত্র—

হ্যাঁ—লোকটাকে তুমি চেনো না, কিন্তু আমি চিনি। যেমন নোংরা তেমনি জঘন্য চরিত্রের—ওর সম্পর্কে একটু সাবধান হওয়াই বোধহয় ভাল—সামনে election তোমার।

আজ সকালে সমাজদর্পণে প্রকাশিত আমার সম্পর্কে নিউজটা পড়ে বুঝতে পারছি, তুমি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছো শুভ্র—

হ্যাঁ—মানে—

আরে বাবা সত্যি কথা বলতে কি, মিথ্যা তো কিছু বলেনি। নামে বেনামে দশ-বারটা ব্যবসাও আছে নীলাদ্রি চৌধুরীর এবং নারী সম্পর্কে তার দুর্বলতাটাও কারো জানতে বাকী নেই—আরে ওসব তো আজকালকার অঙ্গের ভূষণ।

কিন্তু ঐ অভিনেত্রী মিতালী মানে কে, বুঝতে পেরেছো ?

কেন পারবো না! Don't worry my dear brother—নীলাদ্রি চৌধুরীর metalকে ঐ ছুঁচো মিত্র জানে না—

লোকটা আবার তোমার বাইরের ঘরে বসে আছে, দেখে এলাম—

হ্যাঁ দর্শনপ্রার্থী।

দেখা করবে—

বাড়িতে এসেছে যখন দেখা করতে হবে বৈকি—তাছাড়া মিস্ ব্যানার্জীরও তাই ইচ্ছা—

গালাগালি দিও না যেন আবার—

না, না—আমি তো আর পাগল হইনি—

আবার শুভ্র হেসে বলে, যাক শোন—এম. পি. শঙ্করনারায়ণের সঙ্গে কথা বলেছিলে?

হ্যাঁ কালই হোটেলে রাত্রে দেখা হয়েছিল—বলেছি তোমার ফ্যাকট্রির কথা—

কি বুঝলে!

তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছে।

দেখা করে কোন লাভ হবে?

মনে হয়—দেখা তো করো, তারপর আবার আমি বলবো।

তাহলে এখন চলি হে।

এসো—

তুষারশুভ্র বের হয়ে গেল অতঃপর।

পরক্ষণেই প্রায় পরাশর মিত্র ঘরে এসে ঢোকে।

নমস্কার স্যর—

কি খাবেন বলুন—চা কোকো কফি—নীলাদ্রি চৌধুরী বলে ওঠে পরাশরকে সম্বোধন করে তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে।

না, না—ওসব কিছুর প্রয়োজন নেই এখন—আমি এসেছিলাম একটু কাজে স্যর—বিগলিতভাবে পরাশর মিত্র বলে।

কাজ?

হ্যাঁ—মানে আপনার life-এর important ঘটনাগুলো—মানে বুঝতেই তো পারছেন জনগণের প্রতিভূ হতে চলেছেন আপনি লোকসভায়—এ সময়—

কেন, আজকের সমাজদর্পণে যা দিয়েছেন তা বুঝি ঠিক তেমন মুখরোচক হয়ে উঠল না!

ছি ছি, স্যর কি যে বলেন—তাছাড়া ওসব তো—ঠিক আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্টের লেখা—তাই সত্যি কথা জানাবো বলে—

কেন, সে খুব মিথ্যে বলেছে নাকি—কিন্তু শিরোনামায় লেখকের নামটা আপনারই আছে—

তাইতো আসা—

Rectify করবেন?

কি জানেন, আসলে বলতে কি, ওগুলো হচ্ছে স্রেফ আপনাদের মত বহু পরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কে নিউজ পেপার স্টাণ্ট—

তাই বুঝি?

তা ছাড়া ও সবের একটা negetive valueও আছে, জানবেন স্যর—

তাই কিছু positive valueর সংবাদ এবার পরিবেশন করতে চান? কিন্তু আমি একটা কথা বলছিলাম—

বলুন!

বলছিলাম, পণ্ডশ্রম আর নাইবা করলেন। শুনুন মিত্র মশাই—হুল কলমে আপনার আছে হয়ত, কিন্তু নীলাদ্রি চৌধুরীর গায়ে যদি সে হুল ফোটাবেন ভেবে থাকেন, তো বলবো, ভুলই করেছেন—he knows very well how to throw a piece of flesh to a barking pup and to put his feet on its head—in time.

আপনি স্যর দেখছি, সত্যি সত্যিই অত্যন্ত চটেছেন—

Not the least—বরং সকালবেলা উঠে কফি পান করতে করতে আপনাদের নিউজটা পড়তে পড়তে rather I enjoyed a lot—amused—আচ্ছা আপনি তাহলে এখন আসতে পারেন—কথাটা বলে নীলাদ্রি চৌধুরী ঘুরে তাকাল তনিমার দিকে, মিস ব্যানার্জী—

আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই এসেছিলাম স্যর—

নীলাদ্রি পরাশরকে কথাটা শেষ করতে দেয় না। বলে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি করতে, তাই না মিত্র মশাই—

যদি বলেন, তাই—

বলি না—তাই। কিন্তু কিছুদিন আগে হলেও বা সম্ভব ছিল —আজ আর সম্ভব নয়।

মিস ব্যানার্জী—নীলাদ্রি আবার বলে।

বলুন—

আজকের appointment listটা একবার দেখ তো—

পরাশর মিত্র বুঝতে পারে, অতঃপর আর ঘরে থাকা উচিত হবে না। সে নমস্কার জানিয়ে দরজা ঠেলে বের হয়ে যায়—দরজাটা ধীরে ধীরে আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যায়।

নীলাদ্রি ঐদিকেই আবার ঘুরে তাকিয়েছিল—মৃদুকণ্ঠে বলে, মিস ব্যানার্জী—

বলুন—

সামনের শনিবার আফগান হোটেলে যে ককটেল পার্টি দিচ্ছি, তার একটা কার্ড ঐ পরাশর মিত্রকে পাঠিয়ে দিও তো।

কিন্তু স্যর—সেখানে—

পাঠিয়ে দিও—শুনেছি, পরাশর নাকি দশ পেগেও ডাউন হয় না—

কেবল কি মজা দেখবার জন্যই পরাশর মিত্রকে পার্টিতে ডাকছেন? না মদ খাইয়ে লোকটাকে হাত করতে চান?

দুটোর কোনটাই না—

তবে?

ওকে আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চাই আমাকে উদ্দেশ্য করে যে চোখা চোখা বাণগুলো আজকের কাগজে ও ছুঁড়েছে, সেগুলো একটাও আমার গায়ে বেঁধেনি—কিন্তু—

জবাবে নীলাদ্রি যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হলো না। ফোনটা বেজে উঠলো, তনিমাই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যাঁ—আছেন just hold on please, ব্যারিস্টার সেন—

তনিমা রিসিভারটা এগিয়ে দিতে দিতে নীলাদ্রির দিকে কথাটা শেষ করলো।

নীলাদ্রি রিসিভারটা নিল, কে—অনিল—হ্যাঁ—না হে তোমার কেসের সব কাগজগুলো এখনো দেখে উঠতে পারিনি, তবে যেটুকু দেখলাম, আসামী স্বীকার করুক বা না করুক—যে সব evidence

কোর্ট যোগাড় করেছে, তাতে করে তোমার খুব একটা সুবিধে হবে বলেও মনে হচ্ছে না—হ্যাঁ—হ্যাঁ যাবো—জাস্টিস্ মুখার্জীর ঘরে আমার একটা কেসের হিয়ারিং আছে বারটা নাগাদ—হ্যাঁ, হাই-কোর্টেই দেখা হবে। নীলাদ্রি রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

ব্যারিস্টার সেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর সেই মার্ডার কেসটা হাতে নিয়েছেন না? তনিমা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—বদ্রীদাস আগরওয়ালার মার্ডার কেস।

সংবাদপত্রে পড়ছিলাম সেদিন কেসটার কথা। তনিমা বলে, লোয়ার কোর্ট তো মেয়েটিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছে—

ভৃত্য শিবদাস এসে ঘরে ঢুকল, বাবুরা সব ও-ঘরে অপেক্ষা করছেন—

এখন আর দেখা করতে পারব না। পুলকবাবুকে বলে দে, সন্ধ্যায় কোর্ট থেকে ফিরে দেখা করবো—

তনিমা বলে, কিন্তু সন্ধ্যার পর তো আপনার এনগেজমেণ্ট আছে।

কোথায় বল তো?

সন্ধ্যায় স্যর বি. চক্রবর্তীর ছেলের ম্যারেজের পার্টি আছে পোলক স্ট্রীটে—

আর কিছু—

না—আজ আর কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখা হয়নি—

ঠিক আছে—

শিবদাস ইতিমধ্যে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

এই চেকগুলো সই করে দিতে হবে, মিঃ চৌধুরী—

নীলাদ্রি চৌধুরী আর দাঁড়াল না—দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

৩

হাইকোর্ট।

শহরের সর্বোচ্চ আদালত।

বিচিত্র এক হত্যা মামলা।

মামলা অবিশ্যি অত্যন্ত স্পষ্ট। মোটিভ নিয়েই ড্রিংকের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে এক হতভাগ্যকে হত্যা করা হয়েছে।

জুরির বেঞ্চ নয়জন জুরি নিয়ে গঠিত। সবাই শহরের বিশিষ্ট নাগরিক।

জুরি-বেঞ্চ থেকে তাকিয়ে দেখছিল অপরাধিনীকে জুরীরা।

অপরাধিনী এক নারী।

চম্পাবাঈ নামেই শহরে নারীটি পরিচিত এক বারবনিতা।

বয়স খুব বেশী হবে না।

ত্রিশের নীচেই হবে বয়স। রোগা পাতলা চেহারা। গায়ের রঙও যেন কেমন ফ্যাকাশে রুগ্ণ বলে মনে হয়।

অপরাধিনী অসুস্থ বলে কাঠগড়ায় নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বসে আছে, হাত দু'টি কোলের ওপর রাখা। মুখটা দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট।

অপর্যাপ্ত রুক্ষ চুলের কিছুটা বুকের উপর এসে পড়েছে।

নিম্ন আদালতের বিচারের পর সেসনে চালান হয়েছে কেস, শেষ বিচারের জন্য।

মামলার মোটামুটি বিবরণ হচ্ছে—

মাসখানেক আগে আসানসোল অঞ্চলের এক কোলিয়ারীর মালিক ধনী বদ্রীপ্রসাদ আগরওয়ালা তার অফিস স্টাফের মাইনে দেবার জন্য প্রায় প্রতি মাসেই যেমন কলকাতায় নিজে এসে ব্যাংক থেকে নগদ টাকা তুলে নিয়ে যেতো, তেমনি এসেছিল।

কিন্তু টাকাটা তুলে আর সেদিন ফিরে যেতে পারেনি—অন্যান্য কয়েকটা জরুরী কাজ ছিল, সেগুলো সারতে সারতে রাত হয়ে যায়।

হোটেলেই রাতটা কাটিয়ে পরদিন ফিরে যাবে স্থির করে।

রাত আটটা নাগাদ এক বন্ধু আসে—সমীরণ দত্ত।

রাতটা একটু স্ফূর্তি করে কাটানোর জন্য তার সঙ্গে বের হয়—সঙ্গে প্রায় নগদ পনের হাজার টাকা—অতগুলো টাকা হোটেলে রেখে যেতে সাহস পায়নি—সঙ্গে করে একটা ফোলিওর মধ্যে টাকাগুলো নিয়েই বের হয়েছিল বদ্রীপ্রসাদ।

বন্ধু তাকে বিখ্যাত গায়িকা নৃত্যপটীয়সী চম্পাবাঈয়ের বাসায় নিয়ে যায়—গান শোনাবার জন্য।

সেখানে নৃত্যগীতের সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধু মদ্যপান শুরু করে—রাত এগারটা নাগাদ সমীরণ দত্ত চলে যায় কিন্তু বদ্রীপ্রসাদ যায়নি।

সে থেকে গিয়েছিল।

তারপর চম্পাবাঈয়ের ভৃত্য হারাধনের জবানবন্দি থেকে যা জানা যায়, তা হচ্ছে—রাত যখন প্রায় বারটা তখন অত্যধিক মদ্যপানে বদ্রীপ্রসাদ রীতিমত বেসামাল হয়ে পড়েছে অথচ তখনো সমানে মদ্যপান করে চলেছে দেখে চম্পা হারাধনকে ডাকে—

হারু—

মা—

এ লোকটা দেখছি বেহেড মাতাল হয়ে পড়েছে। আমাকে এখান থেকে উঠতেই দিচ্ছে না, লোকটার সঙ্গে অনেকগুলো টাকা আছে।

হারাধন প্রশ্ন করে, টাকা!

হ্যাঁ অনেকগুলো টাকা। তাই তো ওকে এখান থেকে বের করে দিতে পারছি না ঐ মাতাল অবস্থায়।

তা থাকলেই বা—বের করে দিই না—পাঁজাকোলা করে তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে আসি।

না রে হারু—সেটা অন্যায় হবে—

তবে কি করবে মা?

আমার ঘুমের ওষুধগুলো ড্রয়ারে ছিল, দেখছি সব ফুরিয়ে গিয়েছে—তুই চট করে একবার আমাদের ডাক্তারবাবুর কাছে যা, তাঁর কাছ থেকে প্রেসক্রিপসন লিখিয়ে ক'টা পুরিয়া নিয়ে আয়। মদের সঙ্গে একটা পুরিয়া মিশিয়ে দিলেই ঘুমিয়ে পড়বে'খন—

হারাধন চলে যায়।

এবং ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঘুমের ওষুধ নিয়ে এসে চম্পার হাতে দেয়।

হারাধনের আনীত ঘুমের ওষুধের চারটে পুরিয়া থেকেই একটা পুরিয়া মদের সঙ্গে মিশিয়ে চম্পা বদ্রীপ্রসাদকে খাইয়ে দেয়।

বদ্রীপ্রসাদ ঘুমিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই। রাত তখন প্রায় দেড়টা—

অতঃপর চম্পা তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এবং পরের দিন হারাধনের ডাকাডাকিতে বেলা সাতটা নাগাদ চম্পার ঘুম ভাঙে।

মা—সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, হারাধন বলে।

কি হয়েছে হারাধন ?

লোকটা তো মারা গেছে মা—

সেকি !

হ্যাঁ—মরে একেবারে কাঠ। দেখবে চল—কি হবে মা !

চম্পা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দেখে, সত্যিই বদ্রীপ্রসাদ মৃত। তারপর যা হয়—পুলিস আসে। এসে এনকোয়ারী করে এবং ঐ সময়ই কথায় কথায় চম্পাই বলেছিল পুলিসকে, লোকটার সঙ্গে নাকি একটা চামড়ার ফোলিওর মধ্যে অনেকগুলো নোটের বাণ্ডিল ছিল—

পুলিস অফিসার প্রশ্ন করেন, কি করে জানলেন, ফোলিওর মধ্যে অনেকগুলো নোটের বাণ্ডিল ছিল ?

চম্পা জবাব দেয়, কাল রাত্রে নেশার ঘোরে লোকটা অনেকবার বলেছে কথাটা।

কি বলেছে ? পুলিসের প্রশ্ন।

বহুৎ রুপিয়া হ্যায় হামারা পাশ, লোকটা বলে, রুপিয়াকে লিয়ে ফিকার মাত্ করো—একবার ব্যাগ খুলে দেখিয়েও ছিল। তখনই দেখেছিলাম, ফোলিওর মধ্যে ঠাসা নোটের বাণ্ডিল।

তা সে ফোলিওটা কোথায় গেল ?

দেখছি না।

কাল রাত্রে যখন এ-ঘর ছেড়ে যান, ফোলিওটা ছিল ?

হ্যাঁ—ওঁর পাশেই ছিল।

লোকটা যখন টাকার কথা বলে বা ব্যাগ খুলে টাকা দেখায়, তখন এ-ঘরে আর কেউ ছিল আপনি ছাড়া ?

—না, আমি একাই ছিলাম।

চম্পার বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও ফোলিওটা পাওয়া যায় না। হারাধন ও ঝি রাসমণি কেউ টাকা সম্পর্কে কোন হদিস দিতে পারে না।

তখন সকলকেই পুলিস অফিসার অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যান, পরের দিন ঐ বাড়িতে প্রহারারত একজন পুলিসের নজর পড়ে, সামনের বাড়িতে পিছন দিককার জঞ্জালপূর্ণ ছোট গলিটার মধ্যে

একটা শূন্য ফোলিও ব্যাগ পড়ে আছে। ব্যাগে আগরওয়ালার নাম এনগ্রেভ করা ছিল।

চম্পা, হারাধন, চম্পার দরোয়ান, কিষেণলল ও ঝি রাসমণি—সকলকেই গ্রেপ্তার করে চালান দিয়েছিল পুলিস।

ময়না তদন্তে মৃতের পাকস্থলীতে তীব্র বিষ পাওয়া যায়।

অ্যাট্রোপিন বিষ।

এবং শুধু তাও নয়, মদের গ্লাসে যে শেষ তলানিটুকু পড়ে ছিল, তাও কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে অ্যাট্রোপিন বিষ পাওয়া গিয়েছে।

অথচ হারাধন আনীত আর তিনটে যে পুরিয়া বসবার ঘরে টেবিলের উপরে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো অ্যানালিসিস করে কিন্তু দেখা গেছে, সেগুলো ঘুমের ওষুধই, তার মধ্যে অ্যাট্রোপিনের নাম-গন্ধও নেই।

হারাধনও বলেছে তার জবানবন্দিতে, সে চারটে মাত্র ঘুমের ওষুধের পুরিয়া এনেছিল—

পুলিসের ধারণা, ঐ পুরিয়ার ঘুমের ওষুধের প্যাকেট দেয়নি চম্পা। সে-রাত্রে অর্থের লোভে চম্পাবাঈ বদ্রীদাসকে অ্যাট্রোপিন মিশিয়ে সেই অ্যাট্রোপিনযুক্ত মদ খাইয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে, টাকাগুলো তারপর ফোলিও থেকে বের করে নিয়ে পাশের জঞ্জালপূর্ণ গলিটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

যদিও প্রমাণ হয়নি, শেষ পর্যন্ত অ্যাট্রোপিন কোথা থেকে পেয়েছিল চম্পা, তাহলেও সেই পুরিয়াটা মদের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার পর এবং বদ্রীদাস সেই মদ পান করবার সঙ্গে সঙ্গেই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ও আর ওঠে না—এবং মদের গ্লাসের তলানী ও পাকস্থলীতেও যখন অ্যাট্রোপিন পাওয়া গিয়েছে, পুলিসের ধারণা এবং স্থির বিশ্বাস চম্পাই পুরিয়ার সঙ্গে অ্যাট্রোপিন মদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিল তাকে হত্যা করে টাকাগুলো হাতাবার মতলবে।

আর সেই কারণেই অর্থাৎ টাকাগুলো নেবার জন্যই হারাধন যখন বদ্রীদাসকে বাড়ির বাইরে রেখে আসবার কথা বলে, চম্পা স্বীকৃত হয়নি।

হারাধন ও রাসমণি বা দরোয়ান ঐ বাড়িতে সে-রাত্রে আর যারা

ছিল তারা টাকার কথা ঘুণাক্ষরেও জানত না, জবানবন্দিতে বলেছে।

একমাত্র জানত চম্পাই—স্বীকারও করলে সে-কথাটা।

অতএব নিম্ন আদালতের জজ—চম্পাবাঈ-ই একমাত্র হত্যা করতে পারে—এভিডেন্সও তাই বলে—সেই বিচারে চম্পাবাঈকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ও হারাধন, রাসমণি এবং দরোয়ানকে মুক্তি দিয়েছেন।

চম্পা কিন্তু তার জবানবন্দিতে বলেছে, সে হত্যা করেনি—দুর্ঘটনার দিন দুপুর থেকেই তার শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। মধ্যে মধ্যে তার একটা কলিক হতো, সেই কলিকটা ঐদিনই সকাল-বেলা উঠেছিল বলে শরীরটা ভাল ছিল না। কিন্তু বদ্রীপ্রসাদের বন্ধু সমীরণ দত্ত—যে তাকে তার গৃহে দুর্ঘটনার রাত্রে নিয়ে এসে-ছিল সে চম্পার দীর্ঘদিনের পরিচিত।

তার অনুরোধেই শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়েছিল, অসুস্থ শরীর নিয়েই নাচগান করতে। তাছাড়া তার ঐ সময় অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য টাকারও প্রয়োজন ছিল—বদ্রীপ্রসাদ মোটা টাকা দেবে বলে-ছিল—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বদ্রীপ্রসাদ অত্যন্ত মাতাল হয়ে পড়ে যখন বাড়াবাড়ি শুরু করে তখন বাধ্য হয়ে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে মদের সঙ্গে ঘুমের পাউডার মিশিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল। অন্য কোন বিষ তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়নি।

টাকাগুলো কি হয়েছে, সে জানে না। যদিও মত্ত অবস্থায় বদ্রীপ্রসাদ অনেকবার নোটের তাড়াগুলো দেখিয়েছে, ঘর থেকে যখন সে বের হয়ে যায়, তখনো ফোলিওটা টাকা সমেত বদ্রীপ্রসাদের পাশেই পড়েছিল, সে দেখেছিল।

বলাই বাহুল্য, চম্পার জবানবন্দি কেউ বিশ্বাস করেনি।

পুলিসের ধারণা—টাকার জন্যই সে হত্যা করেছে মদের সঙ্গে বিষ দিয়ে সে-রাত্রে বদ্রীপ্রসাদকে। তারপর টাকাগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলেছে।

৪

প্রসিকিউশন কাউনসেল মিঃ সান্যাল জেরা করছিলেন ভৃত্য হারাধনকে।

এক নম্বর সাক্ষী।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হারাধন। বয়স চল্লিশের নীচে হবে না। রোগা পাকানো চেহারা। মাথায় বাহারে টেরি।

কি নাম তোমার?

আজ্ঞে, হারাধন ঘোষ।

বাড়ি?

বাগনান।

চম্পাবাঈয়ের কাছে কতদিন কাজ করছো?

তা প্রায় সাত বছর।

চম্পাবাঈয়ের প্রায়ই লোকজন আসে, তাই না?

হ্যাঁ—

আচ্ছা, তারা কি কেবল গানবাজনাই শুনতো বা নাচ দেখতো—

আজ্ঞে—

বলছি, তারা কি কেবল নাচ গানেই খুশী হয়ে চলে যেত?

তা কি করে বলবো বাবু, তবে কেউ কেউ তো সারারাতও থাকতো।

আচ্ছা, চম্পাবাঈয়ের আর কেউ আছে কিনা বা কোন আত্মীয় তার কাছে ঐ সাত বছর কখনও কেউ এসেছে কিনা, জান?

আজ্ঞে, কাউকে আসতে দেখিনি।

সে-রাত্রে ঘুমের পাউডার তুমি এনে দিয়েছিলে?

আজ্ঞে—চম্পাবাঈ বললো, বাবু বড় বিরক্ত করছে, তাকে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াব—

পাউডারটা মদের সঙ্গে মেশাতে দেখেছিলে তুমি?

হ্যাঁ—দেখেছি বইকি—খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো বাবু শুয়ে পড়ল—তখন কি জানি একেবারেই শেষ হয়ে যাবে।

তোমার আনা ঘুমের পাউডারই কি সেটা ছিল, যেটা চম্পাবাঈ

মদের সঙ্গে মিশিয়েছিল ?

আজ্ঞে তা জানি না, আমি পাউডারগুলো চম্পাবাঈয়ের হাতে দিয়ে তার শোবার ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম।

পুরিয়াটা কি হাতে নিয়ে শোবার ঘর থেকে চম্পাবাঈ ঐ ঘরে আসে ?

আজ্ঞে তাও দেখিনি।

বদ্রীপ্রসাদের ব্যাগটার মধ্যে টাকা ছিল, দেখেছিলে তুমি ?

আজ্ঞে না, টাকার কথা কিছু জানি না।

তুমি সকালে এসে ঐ ঘরে যখন বাবুকে মরে গেছে দেখলে, তখন সেখানে ব্যাগটা ছিল ?

না—

আচ্ছা—সে-রাত্রে কখন ঘুমের ওষুধ এনে দাও তুমি চম্পা-বাঈকে ?

অনেক রাত হবে—

জবানবন্দিতে তুমি বলেছো—রাত প্রায় দেড়টা, তাই কি ?

ঐ রকমই হবে।

ওষুধ এনে দিয়ে তুমি কি করলে ?

চম্পাবাঈকে বলে শুতে যাবো তাই তার জলসাঘরে গিয়েছিলাম। তখনই তো দেখি, তাকে মদের সঙ্গে একটা পুরিয়া ঢেলে মেশাতে।

তারপর—

আজ্ঞে তারপর—

হ্যাঁ—তারপর কি করলে ?

বড্ড ঘুম পেয়েছিল—নীচে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

দ্বিতীয় সাক্ষী চম্পাবাঈয়ের দাসী রাসমণি।

রাসমণির বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না। কালো মোটা-সোটা গোলগাল চেহারা। দেহে স্বাস্থ্য ও যৌবন যেন টলমল করছে।

পরনে ফরাসডাঙ্গার দামী একটা তাঁতের চওড়া কালোপাড় শাড়ি—গায়ে সেমিজ—হাতে একগাছি করে সরু সোনার বালা।

চোখে-মুখে একটা অস্থির চটুলতা যেন।

দুই ভ্রুর মাঝখানে একটা উল্কি।

সর্বক্ষণ পান চিবুচ্ছে।

তোমার নাম রাসমণি? প্রসিকিউশন কাউনসেল প্রশ্ন শুরু করেন।

আজ্ঞে রাসমণি দাসী বটেক।

তোমার মনিবের কাছে কত দিন কাজ করছিলে?

তা বাবু মিথ্যে বলবোকনি--বছরখানেক হবেক বটে—

তোমার বাড়ি?

আজ্ঞে শুসনিয়া—বাঁকুড়ো জিলা।

তুমি সে রাত্রে কোথায় ছিলে, যখন চম্পাবাঈ মদের গ্লাসে ঘুমের ওষুধ মেশায়?

সে তো কতবার বললাম গো—ধরেন ক্যান এক্কেবারে পাশেই—

পাশেই—

হ্যাঁ—দরজার পাশেই—স্পষ্ট দেখাই গেল, কি সব পুরিয়া গেলাসে ঢালা করলেক, খাওয়াইলেক—

তারপর কি হলো?

আহা তখন তো বুঝবার পারিনি গো বাবু, বাবুটি খাবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন নেতায় পড়লে। আমরা ভাবনু ঘুমায় পড়লো বুঝি—তখন কি জানি, বাবুটি এক্কেবারে শেষ ঘুম ঘুমাইছে—মরণ ঘুম।

তারপর তুমি কি করলে?

মাও শুতে চলে গেল—আমরাও গেলাম।

তোমরা?

হুঁ—হারাধন আর আমি—

হারাধনের ঘরেই বুঝি তুমি শুতে গেলে—

ইটা কেমন কথা বললেক গো—হারাধন আমার কে বটে গো—পরপুরুষ—

ওঃ তা তো ঠিকই—

অতঃপর ডাক পড়লো দরোয়ান কিষেণলালের—

সাক্ষী—তিন নম্বর—দরোয়ন কিষেণলাল।

কিষেণলাল এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল—

কি নাম তোমার?

প্রসিকিউশন কাউনসেলের প্রশ্ন—

বাবুজী হামার নাম কিষেণলাল চৌবে আছে—

কোন্ জিলায় ঘর ?

ছাপরা জিলা।

চম্পাবাঈয়ের কাছে কতদিন কাজ করছো চৌবে ?

মহারাজ, কমসে কম পাঁচ সাল তো হোবেই।

আচ্ছা চৌবেজী—

বোলিয়ে হুজুর—

তুমি বলতে পার, ঐ রাত্রে হারাধন কখন ওষুধ আনতে গিয়েছিল, আর কখন ফিরে আসে ?

ও ঠিক হামার মালুম নেহি হ্যায়—

মালুম নেহি হ্যায় ?

নেহি হুজুর—

কেন ?

কিউকি—হামি তো নিদ যাচ্ছিল বাবুজী হামার ঘরে—হারাধন এসে বললে, ও মাঈজীর দাবাই আনতে বাহার, ডাক্তারখানামে যাবে—হামি দরোয়াজা খুলে দিলাম। লেকেন কিতনী রাত থি মুঝে ঠিক ইয়াদ নেহি—

রাত বারো বা সাড়ে বারোটা হতে পারে ?

হো সেকতা—

কতক্ষণ বাদে ফিরল ?

সায়েদ কোই এক ঘণ্টা কি সোয়া ঘণ্টা বাদ।

ওর হাতে ঐ সময় কিছু ছিল ?

দেখা নেহি হাম।

তারপর তুমি দরজায় আবার তালা দিয়ে দিয়েছিলে ?

জরুর।

দরজার তালার চাবি তোমার কাছেই তো থাকত ?

হাঁ বাবুজী—লেকিন মাজীকো পাশভি একঠো কুঞ্জী থি—

ঐ সময় নীলাদ্রি এসে আদালত-কক্ষে প্রবেশ করল।

ব্যারিস্টার অনিল সেন নীলাদ্রিকে দেখে ইশারায় তাকে ডাকে—

নীলাদ্রি এগিয়ে গিয়ে ব্যারিস্টার অনিল সেনের পাশে বসল।

কাঠগড়ায় উপবিষ্ট আসামীর দিকেও একবার তাকাল।

আসামী চম্পাবাঈ মাথা নীচু করে বসে।

ইতিমধ্যে একবারও সে মুখ তোলেনি।

প্রসিকিউশন কাউনসেল একবার আসামীর কাঠগড়ায় উপবিষ্টা চম্পাবাঈয়ের দিকে তাকালেন এবং প্রশ্ন করেন, চম্পাবাঈ—তোমার কাছে একটা চাবি তাহলে থাকত গেটের ?

চম্পাবাঈ যেন অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল।

রুগ্না—কৃশ—

দাঁড়াতে মনে হলো যেন খুব অসুস্থ চম্পাবাঈ।

মুখটা দেখা যাচ্ছে না—চুলে ঢাকা পড়েছে।

প্রসিকিউশন কাউনসেল আবার প্রশ্ন করেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও চম্পাবাঈ।

মুখ না তুলেই দাঁড়িয়ে থাকে চম্পাবাঈ কাঠগড়ায়।

আর একটা চাবি তোমার কাছে থাকত ?

মাথা নীচু করেই জবাব দেয়, হ্যাঁ—

হুঁ।—That's all—চতুর্থ সাক্ষী—সমীরণ দত্ত—

অর্ডালী হাঁক পাড়লো, সাক্ষী সমীরণ দত্ত হাজির—

চম্পাবাঈ দাঁড়িয়েই থাকে মাথাটা নীচু করে।

মাথার চুলে মুখটা ঢাকা পড়েছে—মুখটা দেখা যায় না, ঐ সময় অনিল সেন যেন মৃদু গলায় নীলাদ্রিকে কি বলছিল। নীলাদ্রি মৃদু মৃদু হাসছিল।

৫

কিছুক্ষণের জন্য একটা স্তব্ধতা আদালত কক্ষে।

চতুর্থ সাক্ষী সমীরণ দত্ত—নিহত বদ্রীপ্রসাদের বন্ধু—যে তাকে সে রাত্রে চম্পাবাঈয়ের গৃহে নিয়ে গিয়েছিল।

সাক্ষী সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

বছর-ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মত বয়স হবে সমীরণ দত্তর। পরনে দামী গরম পাঞ্জাবি, কাঁচির ধুতি ও শাল।

আপনার নাম?

সমীরণ দত্ত।

কি করা হয়?

ব্যবসাপত্র আছে।

ভাল আয় নিশ্চয়?

তা ভালই।

ঐ যে মেয়েটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে—ওকে চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই—

তা চিনতে পারছি বৈকি—চম্পাবাঈ—

আপনার সঙ্গে কতদিনের আলাপ চম্পাবাঈয়ের?

তা বছর চার-পাঁচ তো হবেই—

প্রসিকিউশন কাউনসেল এবারে চম্পাবাঈয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, চম্পাবাঈ—

সাড়া নেই—

যেমন দাঁড়িয়েছিল, তেমনি মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে চম্পাবাঈ।

চম্পাবাঈ—মুখ তোল—তাকাও—

তবু সাড়া নেই—

চম্পাবাঈ—শুনতে পাচ্ছো না? মুখ তোল—তাকাও—

ধীরে ধীরে এবারে মুখ তুলল চম্পাবাঈ।

কী শান্ত নিরুদ্বিগ্ন মুখ!

কে বলবে ঐ মেয়েটি একজনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে।

কোন ভাবের বৈলক্ষণ্যই যেন কোথাও এতটুকু নেই। ভাসা ভাসা দুটি চোখ—ছোট সুচারু কপাল—কয়েকটি রুক্ষ চূর্ণকুন্তল কপালের ওপর এসে পড়েছে।

মুখ তো নয়, যেন দেবীপ্রতিমার মুখখানি একেবারে বসানো।

আবার মনে হয়—ঐ স্ত্রীলোক হত্যা করেছে!

নীলাদ্রি স্পষ্ট দেখতে পায় এতক্ষণে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান অপরাধিনীর মুখটা।

চেয়ে দেখো—ঐ ভদ্রলোককে তুমি চেনো?

চিনি।

কে ?

সমীরণবাবু।

কতদিনের আলাপ তোমাদের ?

অনেকদিনের।

পাঁচ দশ বিশ বছর ?

বছর পাঁচেক হবে।

নীলাদ্রি চৌধুরী তখনো চেয়ে ছিল অপরাধিনীর মুখের দিকে নির্নিমেষে। কেন তা সে হয়ত নিজেই জানে না—তবু চেয়ে ছিল।

মুখটার সঙ্গে কি তার কোন পরিচিত জনের মুখের আদল আছে ? মনে মনে ভাবছিল—মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল।

কিন্তু কার—

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নিজের মনে বার বার প্রশ্ন করে নীলাদ্রি চৌধুরী।

বাম গালের উপরে ঐ কালো তিলটা—

প্রসিকিউসন কাউনসেল আবার প্রশ্ন করেন, উনি মধ্যে মধ্যে তোমার কাছে স্ফূর্তি করতে আসতেন ?

উনি আসতেন।

রাত কাটাতেন না ?

না—

কখনো কাটাননি রাত ?

না—

যদি বলি মিথ্যা বলছো ?

মিথ্যা কেন বলবো ?

চম্পাবাঈ আবার মাথা নীচু করে।

ঐ দিনকার মত আদালতের কাজ স্থগিত হলো।

চম্পাবাঈ তখনো মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়েছিল কাঠগড়ায়।

জজসাহেব ভিতরে চলে গেলেন তাঁর কামরায়—জুরিরাও উঠে গেল সকলে। প্রহরীরা এসে আসামী চম্পাবাঈকেও কাঠগড়া থেকে নিয়ে গেল।

অনিল—

কিছু বলছিলেন মিঃ চৌধুরী ? ব্যারিস্টার অনিল সেন নীলাদ্রি চৌধুরীর দিকে তাকালেন।

আপনার কেসের কাগজগুলো আর একবার দেবেন তো—আর একবার পড়ে দেখবো।

আজই আপনার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

তাই দিন।

নীলাদ্রি চৌধুরী আদালত থেকে বের হয়ে আসে। নীলাদ্রি চৌধুরী লক্ষ্য করে না, এতক্ষণ আদালতের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল পরাশর মিত্র—সে নীলাদ্রি চৌধুরীকেই অনুসরণ করে চলে দূর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে এসে উঠে বসল নীলাদ্রি চৌধুরী—

অন্যমনস্ক নীলাদ্রি।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি যাবো তো সাহেব ?

না।

তবে কোন্ দিকে যাবো ?

ময়দানের দিকে চলো।

শীতের বেলা ছোট।

চারটে বাজতে না বাজতেই রোদ পড়ে যায়—ক্রমশঃ আলো অস্পষ্ট হতে শুরু করে একটু একটু করে।

এক জায়গায় এসে গাড়ি থামাতে বলে নীলাদ্রি ড্রাইভারকে।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল ময়দানের ধার ঘেঁষে। গাড়ি থেকে নামল নীলাদ্রি।

মনের মধ্যে অনেক দিন আগেকার একটা গানের সুর আর গোটা দুই কলি যেন গুনগুনিয়ে উঠছে

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই—
(আমি) তোমার প্রেমের কিবা জানি—

দিনশেষের ম্লান অবসন্ন আলোর ময়দানে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে গানের ঐ কলি দুটো যেন স্মৃতির বন্ধ দুয়ারে এসে একটা পাখীর মত ডানা ঝাপটাতে থাকে কেবলই—

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই—

স্মৃতির বন্ধ দরজাটা বুঝি সহসা এক সময় ঈষৎ খুলে যায়—

মনের পাতায় কেবলই যেন থেকে থেকে ভেসে ওঠে সেই মুখখানা—অপরাধিনী হত্যাকারিণীর সেই মুখটা—সেই বাম গালের উপর তিলটা—

কি হলো নীলাদ্রির আজ !

শহরের একজন গণ্যমান্য অন্যতম ধনী নাগরিক প্রখ্যাতনামা একজন আইনজীবী—আসন্ন ইলেকশনে লোকসভার প্রার্থীরূপে সে দাঁড়িয়েছে—

তাদের দল যদি জেতে তো সেণ্ট্রালে ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীও সে হবে ।

এক ডাকে সারা শহরের লোক তাকে চেনে—

সে কিনা তখন থেকে একটা নর্তকী বারবনিতা হত্যাকারিণীর মুখটাই মনের মধ্যে ভাবছে !

পরিচয়হীনা অজ্ঞাত অখ্যাত—সমাজের নীচু স্তরের একটা সামান্য স্ত্রীলোক—

রীতিমত যেন বিরক্ত বোধ করে সহসা নীলাদ্রি নিজের উপরই নিজে ।

পকেট থেকে সিগ্রেট কেসটা বের করে একটা সিগ্রেট ধরায় লাইটারের সাহায্যে অন্যমনস্কভাবে ।

বেশ চারিদিক ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে উঠেছে ।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঝাপসা ঝাপসা দেখা যায় ।

চৌরঙ্গী আলোকমালার লাল নীল সবুজে ঝলমল করছে দূরে যেন স্বপ্নের মত ।

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে বেড়াল নীলাদ্রি অন্ধকার ময়দানে । তারপর আবার একসময় গাড়িতে এসে উঠে বসল, নীলাদ্রি পূর্ববৎ অন্যমনস্ক ।

কোঠি চল—

দামী লাকসারী কার এগিয়ে চলে রেড রোড দিয়ে ।

গৃহে এসে পৌঁছয় এক সময় গাড়ি, কিন্তু নীলাদ্রি অন্যমনস্ক—কোন খেয়ালই নেই ।

ড্রাইভার বলে, সাব কোঠি আ গিয়া—

হ্যাঁ—

নীলাদ্রি গাড়ি থেকে নামল।

দোতলায় উঠতেই ল্যান্ডিংয়ে সেক্রেটারী তনিমা ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—সে কাকে যেন ফোন করছিল।

পদশব্দে ফিরে নীলাদ্রিকে দেখে ফোনটা রেখে দিল তনিমা—

সামনেই ঘড়িতে তখন পৌনে আটটা বাজে, দেখা যায়।

এত দেরি হলো আপনার?

একটু মাঠে বেড়াচ্ছিলাম। মৃদু কণ্ঠে বলে নীলাদ্রি এবং বলতে বলতে নিজের শয়নকক্ষের দিকে এগোয়।

তনিমা কথাটা শুনে যেন একটু বিস্মিত হয়। মাঠে বেড়াচ্ছিল নীলাদ্রি চৌধুরী—যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রুটিনে বাঁধা—ডাইরীর পাতায় যার একটা মুহূর্ত নিজস্ব নেই! সে কিনা ময়দানে বেড়াচ্ছিল!

স্যর চক্রবর্তী বার দুই রিং করেছিলেন—কেমন যেন একটু বিব্রত ভাবেই তনিমা বলে।

স্যর চক্রবর্তী—

হ্যাঁ—আজ তাঁর ছেলের ম্যারেজ পার্টি ছিল—

নীলাদ্রি কোন জবাব দেয় না। অন্যমনস্ক—কি যেন ভাবছে।

রিং করে বলে দেবো যে আপনি কাজে আটকা পড়েছিলেন। একটু পরে আসছেন—

না, না—আজ আর কোথায়ও বেরুব না মিস ব্যানর্জী—feeling a bit tired.

নীলাদ্রি চৌধুরী তার শয়নঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

তনিমা চেয়ে থাকে নীলদ্রির গমনপথের দিকে।

দুই বছরের বেশী সে নীলাদ্রির কাছে চাকরি করছে।

বেশীর ভাগ সময়ই বলতে গেলে লোকটার সঙ্গে থাকে সে। নীলাদ্রির সর্বব্যাপারে দেখাশোনা করে। এবং ক্রমশঃ দুজনার মধ্যে সম্পর্কটাও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—কিছুদিন ধরে যে কারণে অনেকেরই ধারণা হয়েছে, তাদের দুজনার সম্পর্কটা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে শীঘ্রই হয়ত অদূরে ভবিষ্যতে—

নীলাদ্রি ঘরে ঢুকবার পরই খাস পেয়ারের ভৃত্য শিবদাস ছুটে এলো।

চা দেবো, সাহেব?

না—

শিবদাস দাঁড়িয়ে থাকে যদি আর কোন নির্দেশ থাকে প্রভুর।

যা তুই—

শিবদাস চলে গেল।

জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল নীলাদ্রি।

ঝকঝক করছে বাথরুম—দেওয়ালে ইটালিয়ান গ্লেজ টাইলস বসানো। মেঝেতে হোয়াইট মারবেল—বিরাট বাথটব—হট অ্যাণ্ড কোল্ড শাওয়ার—দেওয়ালে দু'দিকে প্রমাণ আরশি বসানো।

বাথটবের পাশে একটা স্ট্যাণ্ডের উপরে একটা ফোন।

সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বাথটবের মধ্যে নামল নীলাদ্রি।

অন্যমনস্ক—চিন্তিত—

হাত দিয়ে বাথটবের জল ছলকাতে থাকে—ঢেউ ওঠে—

ঢেউ—একটা দুটো তিনটে—একটার পর একটা জলের বুকে ছড়িয়ে পড়ে ঢেউগুলো বড় হতে হতে—

অকস্মাৎ স্মৃতির পটে যেন আলোর ঝলকানি—কালো আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিমিলি।

* * পুকুরে নাইতে নেমেছে নীলাদ্রি—সিঁড়িতে বসে পা দিয়ে জল নাচাচ্ছে আজকের নীলাদ্রি নয়, দীর্ঘ আট বছর আগেকার নীলাদ্রি।

টলমল উদ্ধত যৌবন!

পায়ের কাছে ঢেউ উঠছে—উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ কানে এলো নারীকণ্ঠে গানের সুর—

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই—
(আমি) তোমার প্রেমের কি বা জানি—

সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলায় এদিক ওদিক চাইতে চাইতে নীলাদ্রি—

রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিতি
প্রেমের পসরা তুই—

নীলাদ্রির চোখের ওপর যেন ভাসছে—ফেলে আসা জীবনের একটা ছেঁড়া পাতা যেন সহসা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা বাগান—নানাপ্রকারের গাছ-গাছালী—তারই মধ্যে কাকচক্ষু জল, এক দীঘি।

বাঁধানো সিঁড়ি—

শিউলী—

নীলাদ্রি উচ্চকণ্ঠে ডাকে।

নারীকণ্ঠে জবাব ভেসে আসে কোন এক ঝোপের অন্তরাল থেকে—

নেই—ই—

শিউলী—

নেই—ই—

নীলাদ্রি ঝোপটার দিকে এগিয়ে যায়—ডাকে আবার, শিউলী—

নেই—ই—

তারপরই খিলখিল হাসির একটা মিষ্টি ঝরনা যেন ছড়িয়ে যায়।

বাথটবের টেলিফোনটা বেজে ওঠে, ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

নীলাদ্রির স্বপ্ন মিলিয়ে যায়।

হাত বাড়িয়ে বিরক্তচিত্তে ফোনের রিসিভারটা তুলে নেয়।

নীলাদ্রি চৌধুরী স্পীকিং—

নীচের ঘর থেকে ফোনে তনিমার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, তনিমা কথা বলছি, মিঃ চৌধুরী—

বল! নীলাদ্রি ফোনে বলে।

নীচের বসবার ঘর থেকে কথা বলছে তনিমা।

কাল শ্যাম স্কোয়ারে যে বক্তৃতা দেবার কথা আছে আপনার—আপনি আর সন্তোষবাবুই তো বলবেন—

হ্যাঁ—

আর কেউ বক্তৃতা দেবেন না?

তুষারশুভ্রও দেবে।

আপনি এখন কি নীচে নামবেন ?

না।

ছেলেরা আপনার সঙ্গে ইলেকশন ক্যাম্পেন সম্পর্কে কি সব কথা বলতে চায়—তারা হলঘরে অপেক্ষা করছে—

আজ আর আমি নীচে নামব না—কাল সকালে সাড়ে সাতটায় আসতে বল ওদের।

ঠিক আছে—

তনিমা ফোন নামিয়ে রাখল।

পাশেই সাধন সরকার দাঁড়িয়ে ছিল—ইলেকশনে যারা খাটছে, তাদের অন্যতম পাণ্ডা।

সে জিজ্ঞাসা করে, মিঃ চৌধুরী কি বললেন ?

কাল আপনাদের সঙ্গে সকাল সাড়ে সাতটায় মিট করবেন।

তাহলে ওদের তাই বলে দিই—

বলে দিন।

সাধন সরকার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

তনিমাও ঘর থেকে বের হয়ে উপরে তার ঘরের দিকে চলে গেল।

দোতলায় একটা ঘর এ-বাড়িতে তনিমার জন্য নির্দিষ্ট আছে, যতক্ষণ এখানে থাকে, সে কাজকর্মের সময়টুকু বাদে ঐ ঘরেই বিশ্রাম নেয়।

ঘরটি সুন্দর ভাবে সাজানো।

একটি বেড—একপাশে ছোট একটি রাইটিং টেবিল—একটা বুকশেল্ফ্—তার উপরে ফোন।

ফোনের পাশে তার নিজের একটি ফটো ফ্রেমে—

একটা রকিং চেয়ার।

আজ আর যেন বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা করছে না তনিমার, কিন্তু না গেলেও চলবে না—মা ভাববেন।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল তনিমা—রাত সাড়ে আটটা-নটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।

তনিমা এসে রকিং চেয়ারটার উপর বসল। হাত তুলে আলস্য ভাঙল। চোখ বুজল।

আবার একটু পরে উঠল—ঘরের জানলাটা গিয়ে খুলে দিল—কোথায় দূরে কোন বিয়েবাড়িতে বোধহয় সানাই বাজছে।

সানাইয়ে বেহাগের সুর ভেসে আসে।

কতকগুলো জরুরী চিঠিপত্র যা ঐ দিনের দুপুরের ডাকে এসেছে—সেগুলো নিয়ে বসল।

চিঠিগুলো একে একে খুলে প্রয়োজনমত দাগ দিয়ে সাজিয়ে রেখে তনিমা যখন উঠে দাঁড়াল রাত তখন সোয়া নটা।

ঘরের আলো নিভিয়ে বের হয়ে এলো তনিমা। রাত্রে বাড়ি যাবার আগে নীলাদ্রি থাকলে তার সঙ্গে দেখা করে বলে যায়—একবার তাই নীলাদ্রির ঘরের দিকে গেল—কিন্তু দরজা বন্ধ ঘরের।

তনিমা কি ভেবে শিবদাসকে ডেকে সে যাচ্ছে বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ড্রাইভার নীচেই অপেক্ষা করছিল—রাত্রে প্রতিদিন নীলাদ্রির গাড়িই তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

গাড়িতে উঠে বসতেই ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

বাড়িতে এসে যখন পৌঁছল তখন রাত পৌনে দশটা।

কলিংবেল টিপতেই মা সুবালা এসে দরজা খুলে দিলেন।

তিনখানা ঘর নিয়ে ছোট একটি ছিমছাম ফ্ল্যাট। লোকজনের মধ্যে মা-মেয়ে ও একজন ঝি এবং একজন বৃদ্ধ ভৃত্য দাসু।

তনিমা জিজ্ঞাসা করে, দাসু কোথায়? তুমি দরজা খুলে দিলে!

তার জ্বর—বিকেল থেকে—সুবালা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

এ চাকরিতে তনিমা জয়েন করে সুবালার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। একটা মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করছিল তনিমা—বছর দুই হলো নীলাদ্রির সেক্রেটারী হয়ে কাজ করছে—মোটা মাহিনা পায়।

মেয়েকে সেক্রেটারীর কাজ নিতে নিষেধও করেছিলেন সুবালা, কিন্তু সুবালার কথা শোনেনি মেয়ে।

তনিমা নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে সাধারণ একটা শাড়ি পরে বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলো।

দাসী এসে শুধায়, টেবিলে খাবার দেবো দিদিমণি?

না—খাবো না, খিদে নেই—মা খেয়েছেন তো?

হ্যাঁ—

কি করছেন মা ?

শুয়ে পড়েছে।

দাসী চলে গেল।

তনিমা এসে খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়াল।

তনিমা বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টেবিলের কাছে ফিরে এলো—

ড্রয়ার টেনে একটা অ্যালবাম বের করল।

পাতা উল্টে চলে অ্যালবামের। প্রথম দিকে তার নিজেরই নানা বেশের নানা ভঙ্গির ফটো—তারপরই এলো একটা ফটো— নীলাদ্রির।

ফটোয় নীলাদ্রি হাসছে।

অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ফটোটার দিকে তনিমা।

তন্ময় হয়ে যায় যেন তনিমা।

খুট্ করে একটা শব্দ হতেই ও চমকে জানলার দিকে তাকায় —একটা কাবুলি বিড়াল, নাদুসনুদুস।

হেসে ফেলে বিড়ালটির দিকে চেয়ে তনিমা, ওরে দুষ্টু, তুই—

এগিয়ে গিয়ে বিড়ালটাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বলে,এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি—অমন করে চমকে দিতে হয় বুঝি—

বিড়ালটাকে বুকে নিয়ে, অ্যালবামটা হাতে করে শয্যার উপর এসে গা ঢেলে দেয় তনিমা—

বিড়ালটা লাফিয়ে নেমে যায় শয্যা থেকে।

তনিমা অ্যালবামের পাতার উপর গালটা রাখে।

চোখ বোজে।

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই তনিমা তাড়াতাড়ি উঠে প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে পড়ে।

নীলাদ্রির গৃহে পেঁছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই শিবদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

শিবদাস দু'হাতে চায়ের ট্রে টা ধরে নীলাদ্রির শয়নঘরের দিকে চলেছে।

শিবদাস—একি এত বেলা হয়ে গিয়েছে, সাহেবকে তুমি এখনো মর্নিং-টি দাওনি—

বার চারেক চা নিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলেছি ভোর পাঁচটা থেকে —ভিতর থেকে দরজা বন্ধ—

বন্ধ ?

হ্যাঁ—সাহেব বোধহয় এখনও ঘুমোচ্ছেন—

ঘুমোচ্ছেন—সেকি—আজ রাইডিংয়ে যাননি মিঃ চৌধুরী ?

না—আবদুল তো ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করে করে ফিরে গিয়েছে।

এখনো ওঠেননি—শরীর খারাপ হয়নি তো ? কাল পার্টিতে গেলেন না—কখনো কোন ফরমালিটিজ তাঁর বাদ যায় না কোন দিন —কথাগুলো মৃদুকণ্ঠে স্বগতোক্তির মত বলতে বলতে নীলাদ্রির শয়নঘরের দিকে এগিয়ে যায় তনিমা।

দরজা বন্ধ ভিতর থেকে তখনো।

এক মুহূর্ত যেন কি ভাবে তনিমা। তারপর বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টোকা দেয়।

কোন সাড়া নেই।

আবার টোকা দেয় একটু থেমে তনিমা।

মিঃ চৌধুরী,—মৃদুকণ্ঠে ডাকে তনিমা।

ল্যাণ্ডিংয়ের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সকাল সাতটা বাজল।

দরজাটা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি।

পরনে পায়জামা ও স্লীপিং গাউন। মাথার চুল এলোমেলো। ক্লান্ত চোখের তারায় এবং চোখের কোলে রাত জাগার চিহ্ন।

এসো—

তনিমা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল—সামনের টেবিলটার উপরে অজস্র সিগ্রেটের টুকরো—অ্যাশট্রেটা উপছে পড়ছে—

ঘরের বাতাসে উগ্র একটা সিগ্রেটের গন্ধ।

আপনি কি কাল ঘুমাননি ? তনিমা জিজ্ঞাসা করে নীলাদ্রিকে।

না—ঘুম এলো না কিছুতেই—

নীলাদ্রি যেন অত্যন্ত ক্লান্ত—বিষণ্ণ গলার স্বর। একটা সোফার

উপরে বসল নীলাদ্রি।

সত্যিই সে সারাটা রাত জেগেই কাটিয়েছে।

পায়চারি করেছে আর একটার পর একটা সিগ্রেট শেষ করেছে।

নীলাদ্রির চরিত্রের যা সম্পূর্ণ বিপরীত। গত দু বছর তনিমা ঘনিষ্ঠভাবে চিনেছে, কিন্তু এমন তো কখনো হয়নি—

শরীর ভাল আছে তো? তনিমা প্রশ্ন করে।

শিবদাসটা এখনো চা দিয়ে গেল না কেন, দেখ তো তনিমা—

শিবদাস চা নিয়ে বার চারেক এসে দরজা বন্ধ দেখে আপনি হয়ত ঘুমোচ্ছেন ভেবে ফিবে গিয়েছে—

শিবদাস ঐ সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

গর্দভ—ডাকিসনি কেন আমাকে—নীলাদ্রি বলে।

তনিমা এগিয়ে এসে কাপে দুধ চিনি দিয়ে চা তৈরী করতে থাকে।

শিবদাস বলে, বাবুরা অনেকক্ষণ থেকে এসে নীচে বসে আছে।

চা-বিস্কুট-সিগ্রেট দিয়েছিস বাবুদের?

তনিমার হাত থেকে ধূমায়িত চায়ের কাপটা নিতে নিতে বলে নীলাদ্রি শিবদাসের মুখের দিকে চেয়ে।

হ্যাঁ, দুবার চা হয়ে গিয়েছে—

ঠিক আছে, তুই যা নীচে—দেখিস, বাবুদের কোন কিছুর দরকার হলে দিবি।

শিবদাস ঘর থেকে চলে যায়।

তনিমা—

বলুন?

আজ আর আমি নীচে যাবো না—

শরীরটা কি আপনার ভাল নেই, মিঃ চৌধুরী?

না, না—I am quite fit. নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি ওদের সঙ্গে গিয়ে কথা বল—

যাচ্ছি, তারপর একটু থেমে বলে তনিমা, আজ কোর্টে না হয় নাই গেলেন—rest নিন—।

না, না—যেতে হবে, একবার ড্রাইভারকে বলে দিও, সাড়ে দশটায় হাইকোর্ট যাবো।

গতকালের চিঠিপত্রগুলো নিয়ে আসবো? তনিমা জিজ্ঞাসা করল।

না থাক—অন্য এক সময় দেখবো।

তনিমার মনে হলো নীলাদ্রির যেন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, কি ভেবে তনিমা নীলাদ্রিকে আর বিরক্ত করে না—উঠে পড়ে।

নীলাদ্রি সোফার উপর বসেই থাকে।

গতকালকের দেখা সেই মুখটা যেন কিছুতেই মনের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারছে না নীলাদ্রি। কিন্তু কেন—কেন?

আশ্চর্য রকমের মিল। বিশেষ করে সেই তিলটা।

কিন্তু কেমন করে তা হবে!

সেই শিউলী—কেমন করে শহরের এক জঘন্য বারবনিতা—খুনী চম্পাবাঈ হতে পারে।

অমন শান্ত সরল—না, না—অসম্ভব।

কিন্তু আশ্চর্য মিল।

কাল রাত্রে কিছুক্ষণ চেষ্টা করেছিল কেসের ফাইলটা পড়তে নীলাদ্রি কিন্তু পারেনি।

বারবার কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে।

আজ আবার আদালতে সেই মামলার শুনানী।

কিসের একটা অন্ধ আকর্ষণ যেন টানতে থাকে আদালত-গৃহের দিকে নীলাদ্রিকে। তার নিজের কোন কেস ছিল না ঐদিন আদালতে, তবু প্রস্তুত হয়ে দশটার মধ্যেই বের হয়ে পড়লো নীলাদ্রি হাই-কোর্টের দিকে।

৭

সেই আদালত-গৃহ পূর্ব দিনের।

নীলাদ্রি শুনানী শুরু হবার আগেই এসে ঘরে ঢোকে অনিল সেনের সঙ্গে এবং তার পাশে বসে।

একটু পরে আসামীকে নিয়ে এসে দাঁড় করানো হলো আসামীর কাঠগড়ায়।

কালকের সেই মেয়েটি।

মুখের উপরে আজ আর চুলের গোছা নেই। গালের সেই তিলটি স্পষ্ট।

মুখটা স্পষ্টই দেখা যায়।

অবিকল—ঠিক সেই মুখ।

না ভুল নেই কোন। স্মৃতির পৃষ্ঠায় যা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল আজ তা প্রখর দিনের আলোর মতই স্পষ্ট—

বর্তমান মামলার অন্যতম ও পঞ্চম সাক্ষী সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন তখন।

ডাঃ মণি অধিকারী।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে—তা প্রায় বছর পঞ্চাশের উপরেই হবে!

রোগা লম্বা চেহারা—মাথার চুল প্রায় অর্ধেক পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

প্রসিকিউশন কাউনসেল প্রশ্ন করছেন, ডাঃ অধিকারী, আপনি কতদিন প্র্যাকটিস করছেন?

উনত্রিশ বছর—

বরাবর এই শহরেই?

হ্যাঁ—

চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

বছর পাঁচেক হবে।

চম্পাবাঈকে আপনি ঘুমের ওষুধ দিতেন?

হ্যাঁ—

কতদিন থেকে চম্পাবাঈ ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করছে?

গত বছর তিনেক হবে—

চম্পাবাঈ regular ঘুমের ওষুধ খেতো কি?

হ্যাঁ—গত বছর তিনেক থেকে ওর শরীরটা ভাল থাকছে না—

কি অসুখ—

অনেক দিন ইনটেসটাইন্যাল টি. বি.-তে ভুগেছে—ইদানীং আবার গল ব্লাডার কলিক—মাসের মধ্যে পনের দিন তো অসুস্থই থাকে, যে কারণে আমি জানি, নাচ-গান সে করতে পারতও না নিয়মিত—রোজগারপাতিও ইদানীং তাই তেমন ছিল না—

কিন্তু ঘুমের পাউডার দিতেন কেন ওকে?

প্রথম প্রথম ঘুম হতো না বলে দিয়েছি—পরে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে পাউডার না খেলে ও রাত্রে ঘুমাতেই পারত না।

কোন নেশা করত না চম্পাবাঈ ?

আমি যতদূর জানি, ও কখনো কোন নেশার দ্রব্য স্পর্শ করেনি।

নাচ-গান ছাড়া অন্য কোন ভাবে চম্পাবাঈ অর্থোপার্জন করত না ?

আগে করতো কিনা জানি না, তবে ইদানীং করছে বলে মনে হয় না—

কেন ?

দীর্ঘদিন ধরে ইনটেসটাইন্যাল টি. বি.-তে ভুগে ভুগে ওর শরীরের যা অবস্থা, তাতে কোন অসংযম বা উচ্ছৃংখলতা ওর শরীরের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না—আর যতদূর আমার মনে হয়, নাচ-গানের দ্বারা অর্থোপার্জন করলেও ঠিক যা আপনি মীন করছেন, সে শ্রেণীর মেয়ে ও না।

That's all—প্রসিকিউশন কাউনসেল বললেন।

প্রসিকিউশন কাউনসেলের জেরা ও ডাঃ অধিকারীর জবাব শুনতে শুনতে মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিল নীলাদ্রি অপরাধিনীর মুখের দিকে।

এবং গতকাল অপরাধিনী সম্পর্কে যে সন্দেহ নীলাদ্রির মনে জেগেছিল আজ যেন আরো সেটা দৃঢ়মূল হয়।

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হত্যাপরাধে অপ-রাধিনী ঐ চম্পাবাঈকে নীলাদ্রি।

কিন্তু চম্পাবাঈ নামটা তো তার পরিচিত নয়।

নীলাদ্রি কি যেন অনিল সেনকে ঐ সময় মৃদু কণ্ঠে বললো—অনিল সেন উঠে দাঁড়ালেন প্রশ্ন করবার জন্য।

তোমার নাম চম্পাবাঈ ?

সঙ্গে সঙ্গে চম্পাবাঈ মুখ তুলে প্রশ্নকারী ব্যারিস্টার অনিল সেনের দিকে তাকাল।

শান্ত ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি।

হ্যাঁ—মৃদু কণ্ঠে চম্পাবাঈ জবাব দেয়।

আর কোন নাম নেই তোমার ?

না তো—

এক এক জনের তো কত সময় দুটো-তিনটেও নাম থাকে—ডাক নাম—পোশাকী—আদরের নাম—

চম্পাই আমার নাম। আর কোন নাম নেই—

তোমার বাড়ি কোথায় ?

জানি না !

বাড়ি কোথায় তোমার, তুমি জান না—চিরদিন কি কলকাতায় আছো ?

হ্যাঁ—

মা-বাবা তোমার—

ছোটবেলায় মারা গেছে, শুনেছি—

কার কাছে শুনেছো ?

মনে নেই।

নাচ-গান তুমি কতদিন থেকে করছো ?

ছোটবেলা থেকেই নাচতে গাইতে পারতাম—বড় হয়ে তাই নাচ-গান করেই কাটাতে শুরু করি—

বিয়ে থা কখনো হয়নি ?

দেহপসারিণী নর্তকী আমি—বাঈজী—বিয়ে আমরা করি না —কিন্তু এ সব প্রশ্ন কেন আপনি আমাকে করছেন ? সামান্য এক নর্তকী বাঈজীর জন্মবৃত্তান্ত জেনে কি হবে আপনার ?

অনেকে তো ভাল ঘরে জন্মায়—তারপর হয়ত ঘটনাচক্রে এই পথে এসে পড়ে বা আসতে বাধ্য হয়—

চম্পাবাঈ কোন জবাব দেয় না, অনিল সেনের প্রশ্নের।

আমার কথার তুমি জবাব দাওনি, চম্পাবাঈ—

কিছু জবাব দেবার নেই—

মাথা নীচু করেই কথাগুলো বলে চম্পা।

পরের দিন।

প্রসিকিউশন কাউনসেল চম্পাবাঈকে প্রশ্ন করছিলেন।

তুমি তোমার জবানবন্দিতে বলেছো, ঘুমের ওষুধ তোমার ফুরিয়ে গিয়েছিল—হারাধনকে দিয়ে তুমি সে-রাত্রে আবার ঘুমের ওষুধ

আনিয়েছিলে—

হ্যাঁ—

কটা পাউডার এনে দিয়েছিল সে-রাত্রে হারাধন তোমাকে ?

চারটে—

তুমি বলেছো, তারই একটা তুমি বদ্রীপ্রসাদের মদের গেলাসে মিশিয়ে দিয়েছিলে—

হ্যাঁ—

আহা, তুমি তো সে-রাত্রে ঘুমের পাউডার খাওনি ?

না—

কেন ?

এমনিতেই বড় ক্লান্ত ছিলাম—ঘুমও আসছিল, তাই আর পাউ-ডার খাবার কথা মনে হয়নি।

তুমি তাহলে ঘুমের পাউডার সে-রাত্রে খাওনি ?

না—

আচ্ছা তুমি তো তোমার জবানবন্দীতে বলেছো, ঘুমের পাউডার তোমার ফুরিয়ে গিয়েছিল—তারপর হারাধন সে-রাত্রে ডাক্তারখানা থেকে যে চারটে পাউডার এনে দিয়েছিল, তা থেকেই একটা তুমি বদ্রীপ্রসাদকে খাইয়েছিলে—

হ্যাঁ—

কিন্তু তোমার ঘরের টেবিলের উপরে যে বাকী তিনটে ঘুমের পাউডারের পুরিয়া পুলিস পরের দিন সার্চ করতে গিয়ে পেয়েছিল, তার মধ্যে অ্যানালিসিস করে কোন অ্যাট্রোপিন পাওয়া যায়নি—অথচ যে গ্ল্যাসে সে রাত্রে বদ্রীপ্রসাদ আগরওয়ালা মদ্যপান করেছিল তার শেষ তলানীটুকু Chemical analysis করে ও মৃতদেহের পাকস্থলীর জীর্ণ খাদ্যদ্রব্য analysis করে অ্যাট্রোপিন পাওয়া গিয়েছে, নিশ্চয়ই শুনেছো ?

হ্যাঁ—

কোথা থেকে ঐ বিষ অ্যাট্রোপিন এলো ?

জানি না।

তোমার চোখের ব্যবহারের জন্য কোন অ্যাট্রোপিন লোশন কি তোমার ঘরে ছিল ?

না।

যে মদ বদ্রীপ্রসাদ খেয়েছিল, সে কোথা থেকে এসেছিল?

আমার বাড়িতে থাকত বোতল। খদ্দেরদের জন্য রাখতে হতো, সেই বোতল থেকেই মদ্যপান করেছিল সে।

বদ্রীপ্রসাদকে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিলে কেন?

বড্ড বিরক্ত করছিল, তাই—

তাহলে তুমি বলতে চাও—বদ্রীপ্রসাদকে ঘুমের পাউডার ছাড়া তার মদের গ্লাসে অন্য কিছুই তুমি মিশিয়ে দাওনি?

না। হারাধনের আনা পাউডারই একটা মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা ঐ একই প্রশ্ন বার বার করছেন কেন—আমি তো বলেছিই, তাকে ঘুম পাড়াবার জন্য ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম, কোন বিষ আমি আগরওয়ালাকে দিইনি।

তাই যদি না হবে তো সেই পাউডার খেয়ে তার মৃত্যু হবে কেন আর মৃতের পাকস্থলীতেই বা বিষ পাওয়া যাবে কেন এবং গ্লাসের তলানীতেই বা বিষ পাওয়া যাবে কেন?

জানি না। নিম্ন আদালতও আমার কথা বিশ্বাস করেনি—আপনারাও করবেন না, জানি—মিথ্যে তবে এভাবে আমাকে বিরক্ত করছেন কেন—আপনারা তো প্রমাণ পেয়েছেনই, আমি তাকে বিষ দিয়ে মেরেছি—আমার ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিলেই তো সব চুকে যায়—

কথাগুলো যেন একটা বিরক্তির সঙ্গেই বলে চম্পাবাঈ মাথা নিচু করে আবার।

ঐ সময় ডিফেন্স কাউনসেল অনিল সেন বলেন, ডাঃ অধিকারীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

জজসাহেব অনুমতি দিলেন।

ডাঃ অধিকারী সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন আবার।

ডাঃ অধিকারী, অনিল সেন প্রশ্ন করেন, কয়েকটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—

বলুন।

সে-রাত্রে হারাধন কখন আপনার কাছে চম্পাবাঈয়ের জন্য ঘুমের ওষুধের কথা বলতে যায়? মানে রাত্রি তখন কটা?

ঘুমোচ্ছিলাম—চাকর এসে ঘুম থেকে তোলে—ঠিক বলতে পারি না—মানে সময়টা ঠিক দেখিনি—

আপনি প্রেসক্রিপসন করে দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ—

ঘুমের চোখে প্রেসক্রিপসন লিখতে কোন ভুল হয়নি তো ?

ডাক্তারদের তা হয় না—

আমি জানি তা, তবু অনেক সময় তো বড় বড় ডাক্তারদের—

ও রকম ভুল হয় না—

আচ্ছা, আপনি তো বলেছেন, অনেকদিন ধরেই চম্পাবাঈ নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খেতো—যে ডাক্তারখানা থেকে চম্পাবাঈ ওষুধ নিত সে তো নিশ্চয়ই আপনি জানতেন—হারাধনকে তো সেখানেই যেতে বলতে পারতেন—

তা আমি করতাম না আর করা উচিতও নয়। তা ছাড়া সাধারণত অনেকদিন ধরে চম্পাবাঈ ঘুমের ওষুধ খাচ্ছিল সত্যি—তাই মধ্যে মধ্যে আমি প্রেসক্রিপসন বদলে দিতাম, যাতে করে ঘুমের কোন একটা বিশেষ ড্রাগে সে অ্যাডিকটেড না হয়ে পড়ে—

কিন্তু একজনের দীর্ঘদিন নিয়মিত ঘুমের ওষুধ কি খাওয়া উচিত—মানে আপনারা ডাক্তাররা কি সেটা সাপোর্ট করেন ?

না করি না—তবে একটা কথা কি জানেন, যারা কোন একটা ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ সেবন করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাদের সেই অভ্যাসটা তখন দেখা গিয়েছে শারীরিক প্রয়োজনের চাইতে মানসিক প্রয়োজনটা হয় বেশী—মানে আমি বলতে চাই, প্রয়োজনটা তখন মানসিকে গিয়ে দাঁড়ায়—

আচ্ছা আদালতে চার নম্বর এফিডেবিট হিসাবে যে প্রেসক্রিপসনটা দেখানো হয়েছে এ মামলায়, যেটা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন—

হ্যাঁ দেখেছি—।

সেটা আপনারই প্রেসক্রিপসন তো ?

হ্যাঁ—

আচ্ছা, আপনি যে ঘুমের জন্য সেদিন পাউডার করে দিয়েছিলেন, সেটা বেশী পরিমাণে খেয়ে কি মৃত্যু ঘটতে পারে কারো ?

না—তবে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারে দুটো বা তিনটে পাউডার

একসঙ্গে খেলে—

অনিল সেন ডাঃ অধিকারীকে প্রশ্ন করছে যখন, নীলাদ্রির হঠাৎ একসময় নজরে পড়ে, চম্পাবাঈ তার দিকে যেন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই চম্পাবাঈ দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

ঐ দিনই সন্ধ্যায়—

শ্যাম স্কোয়ারে ইলেকশনের বক্তৃতা দিতে উঠে নীলাদ্রিকে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হয়।

বক্তা হিসাবে বরাবরই তার সুনাম—চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে সে, কিন্তু সেদিন বক্তৃতামঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিতে দিতে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হয় তাকে—থেমে থেমে যায় বার বার।

ডায়াসের একপাশে তনিমা বসে ছিল—

নীলাদ্রিকে ঐভাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে থেমে থেমে যেতে দেখে ও একটু যেন বিস্মিতই হয়—

শুধু তাই নয়, গত দুদিন থেকেই তনিমার মনে হচ্ছে যেন নীলাদ্রি কেমন অন্যমনস্ক—সর্বক্ষণ কি যেন একটা ভাবছে।

বিশেষ করে সেদিন হাইকোর্ট থেকে আসার পর থেকেই পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে। আরো পরে সে ড্রাইভারের মুখে শুনেছিল, হাইকোর্ট থেকে বের হয়ে নীলাদ্রি নাকি সোজা ময়দানে চলে গিয়েছিল—

তনিমা জিজ্ঞাসা করেছিল ড্রাইভারকে রীতিমত বিস্মিত হয়েই, ময়দানে গিয়েছিল সাহেব?

হ্যাঁ দিদিমণি—গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে কতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন—আমার তো কেমন যেন ভয়ই করছিল।

শিবদাসও বলেছিল—সে-রাত্রে নাকি নীলাদ্রি ডাইনিং টেবিলেই যায়নি।

বাবুর্চী বসে থেকে থেকে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তারপর সকালের ব্যাপারটা তো সে ঘরে ঢুকে নিজের চোখেই দেখেছে—অ্যাসট্রে উপচে পড়ছে পোড়া সিগ্রেটের টুকরোয় আর ছাইয়ে।

আজ আবার অসংলগ্নভাবে থেমে থেমে বক্তৃতা।

শ্যাম স্কোয়ারের বক্তৃতাপর্ব শেষ হবার পর রেইনবো ক্লাবে একটা পার্টি ছিল—কিন্তু নীলাদ্রি গাড়িতে উঠে বললে, বাড়ি চল—

তনিমা পাশেই বসে ছিল।

সে জিজ্ঞাসা করে, রেইনবো ক্লাবে যাবেন না? যোগজীবনবাবুর ককটেল পার্টি আছে—

না—বাড়ি চল—

না গেলে যোগজীবনবাবু অসন্তুষ্ট হবেন না?

হঠাৎ যেন নীলাদ্রি অনাবশ্যক রূঢ় হয়ে ওঠে—তিক্তকণ্ঠে বলে, what can I do—I am tired—কেন তুমি বুঝতে পারছো না তনিমা, extremely tired আমি।

বিস্মিত থতমত খেয়ে তনিমা তাকায় নীলাদ্রির মুখের দিকে, কিন্তু চলমান গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে নীলাদ্রির মুখটা ভাল করে দেখতে পায় না তনিমা।

শরীরটা কি ভাল লাগছে না?

Please—please তনিমা—ভাল লাগছে না—আমার কিছু ভাল লাগছে না, বাড়ি চল।

৮

বাড়িতে পেঁছে নীলাদ্রি সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

তনিমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

শিবদাস প্রভুকে দেখে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তনিমা চোখ ইশারায় তাকে ঘরে যেতে নিষেধ করে।

শিবদাস একটু যেন বিস্মিত হয়েই তনিমার দিকে তাকায়।

বলে, সাহেবের ঘরে যাবো না, দিদিমণি?

না। এখন যেও না—

তনিমা কথাটা বলে ঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরে এসে কয়েকটা কাগজপত্র নিল তনিমা—আবার নীচে অফিসঘরে নেমে গেল।

ইলেকশনের দিন প্রায় এসে গেল—

মাত্র মাস দেড়েক হাতে আছে। এই সময়ই ইলেকশনের কাজটা জোরদার করা দরকার।

নীলাদ্রি চৌধুরীর প্রতিপক্ষকে যদিও নীলাদ্রির কোন ভয় নেই তথাপি জনগণের মতিগতির ব্যাপার বলা যায় না।

এদের কখন যে কি মতিগতি হয়—কোন্ দিকে যে ওরা কখন ঢলে পড়ে, কাকে কখন মাথায় তুলবে আবার কাকে কখন ধুলোয় টেনে বসিয়ে দেবে, বিধাতাও বুঝি তা জানেন না।

কাজেই ভাল করে ইলেকশনের কাজ করে যেতে হবে।

ইলেকশনের ক্যাম্পেনের ব্যাপারে কিছু কাগজপত্র জমা হয়েছে গত দুদিন ধরে—সেগুলো গুছিয়ে যেমন করেই হোক কাল সকালে কোন এক সময় নীলাদ্রির কাছে পেশ করতে হবে।

তনিমা টেবিলের সামনে বসল।

কাজ করতে করতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল তনিমা। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

মিঃ নীলাদ্রি চৌধুরীর সেক্রেটারী স্পীকিং—

মিস ব্যানার্জী—গুড ইভনিং—ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আমি পরাশর মিত্র কথা বলছি—

ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায় তনিমার পরাশর মিত্র নামটা শুনেই।

মিঃ চৌধুরী এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন—তনিমা একটু যেন বিরক্তি কণ্ঠেই বলে।

মিঃ নীলাদ্রি চৌধুরী নয়। আমি আপনাকে খোঁজ করছিলাম বিশেষ করে—

আমাকে?

হ্যাঁ—কারণ আজ মিস ব্যানার্জী হলেও দুদিন বাদেই তো হচ্ছেন মিসেস নীলাদ্রি চৌধুরী!

তনিমার মুখটা সহসা যেন অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বলে, তা ওটা তো অত্যন্ত পুরনো খবর—

জানেন না, পুরনো চালই তো ভাতে বাড়ে—

দেখুন মিঃ মিত্র, আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন—বলে ফোনটা

নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল কিন্তু ওপাশ থেকে বাধা এলো আবার।

আহা শুনুন শুনুন—ব্যস্ত আজকের দিনে তো আমরা সবাই। তবুও ফরম্যালিটিজ বজায় রাখতেই হয়—

দেখুন ভণিতা রেখে কাজের কথাটা বলুন তো!

কোন্‌টা যে কাজ আর কোন্‌টা অকাজ সেটা আমরা সব সময়ই কি বুঝতে পারি ঠিক ঠিক, মিস ব্যানার্জী—

দেখুন মিঃ মিত্র, এইমাত্র আপনাকে আমি বললাম যে আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি এখন একটু—

যাই বলুন—সত্যি একেই বলে বোধহয় বরাত—মানে ভাগ্য—কোথায় কোন্‌ অফিসে সামান্য মাইনের একজন কেরানী ছিলেন, ছোট একতলা বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে মাথা খুঁড়ে মরছিলেন আর এখন একেবারে সাজানো ফ্ল্যাটে—দুগ্ধফেননিভ শয্যা—রাজকীয় খাদ্য—

শুনুন মিঃ মিত্র—আপনি হয়ত জানেন না—

কি জানি না বলুন তো!

আমার নামে কুৎসা রটালে আমি তাকে ককটেল পার্টিতে ইনভাইট করি না R. S. V. P. লিখে—

করেন না বুঝি—

না—আমি তার জবাব দিই আমার যে হাঙর মাছের সরু চাবুকটা সর্বদা আমার হাতের হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে থাকে সেটা দিয়ে—কিংবা পায়ের চপ্পল দিয়ে—

ঐ দেখুন, আপনি চটেছেন দেখছি—আপনার সৌভাগ্যে সামান্য একটু আনন্দ প্রকাশ করেছি মাত্র—nothing more nothing less. যাকগে শুনুন—যে জন্য ফোন করছিলাম—মিঃ চৌধুরীকে সত্যি কেন বলুন তো একটু upset দেখছি ক'দিন ধরে। বিশেষ করে আদালতে সেদিন হঠাৎ জাস্টিস মুখার্জীর ঘরে যাবার পর থেকেই—তারপর আজ শ্যাম স্কোয়ারের বক্তৃতাটাও যেন কেমন পানসে পানসে লাগল—

ওঁর শরীরটা ভাল নেই—

কেন বলুন তো?

আপনি ডাক্তার হলে বলতাম, হয়ত পরামর্শও নিতাম কিন্তু

আপনি যখন তা নন—আচ্ছা good night—

তনিমা ঠক করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল এবং শুধু নামিয়ে রাখাই নয় পকেট থেকে ফোনের কানেকশনটা খুলে দিল।

মিঃ চৌধুরী ঠিকই বলেছিলেন—একটা ছুঁচোই।

হঠাৎ ঐ সময় দেয়ালে ঘড়িটার দিকে নজর পড়ল—রাত প্রায় দশটা।

উঃ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে—উঠতে যাবে—শিবদাস এসে ঘরে ঢুকল।

দিদিমণি—

কি শিবদাস—

সাহেব তো এখনো ডাইনিং টেবিলে এলেন না—

আসেননি?

না—দরজার ফুটো দিয়ে দেখলাম, ঘরে আলো জ্বলছে—

দরজায় নক করেছিলে?

না—

আচ্ছা চলো—

দরজার eye দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল তনিমা—

সত্যিই ঘরে আলো জ্বলছে।

আর নীলাদ্রি চৌধুরী ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। এক মুহূর্ত তনিমা কি যেন ভাবল, একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর দরজার গায়ে নক করল—

কে?

আমি—তনিমা জবাব দেয়।

আজ আর কোন কাজ নেই—তুমি যেতে পারো—

শিবদাস বসে আছে—

বলে দাও, রাত্রে কিছু খাবো না—

শিবদাস পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে সবই শুনতে পায়।

শিবদাস বলে, কি হয়েছে সাহেবের বলুন তো দিদিমণি—আজ দুদিন থেকে ভাল করে খাচ্ছেন না, কারো সঙ্গে কথা বলছেন না—

শিবদাস দীর্ঘদিন নীলাদ্রির কাছে আছে।

ভৃত্য হলেও তনিমা জানে, সেই একপ্রকার অভিভাবক নীলাদ্রির।
তাছাড়া শিবদাস অত্যন্ত স্নেহও করে নীলাদ্রিকে।

শিবদাস আবার কতকটা যেন খেদোক্তির মতই বলে, রাজার ঐশ্বর্য—এত লেখাপড়া শিখলেন—এত নাম যশ—অথচ একটা বিয়ে-থা করলেন না—যে বয়েসের যা—

শিবদাস, তোমরা খেয়ে নাওগে—আমি চলি—তনিমা বলে।

তনিমা কিন্তু সে-রাত্রে বাড়ি গেল না শেষ পর্যন্ত কি ভেবে।

তার ঘরে ঢুকে বাড়িতে তার মা সুবালাকে একটা ফোন করে দিল, ইলেকশনের জরুরী কাজে সে আটকা পড়েছে, আজ রাত্রে আর সে বাড়ি যাবে না।

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে সুবালা কিছুই বললেন না। মেয়ের ব্যাপারে তিনি একেবারেই ইদানীং চুপ করে গিয়েছিলেন।

ফোন রেখে দিয়ে তনিমা চেয়ারটায় এসে বসল। একটা জরুরী চিঠির ফাইল টেনে নিল।

শিবদাস ঐ সময় আবার এসে ঘরে ঢোকে, দিদিমণি—

কি শিবদাস?

আপনার কি যেতে দেরি হবে, ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করছে—

আজ আর যাবো না বাড়িতে শিবদাস।

যাবেন না!

না—কিছু জরুরী কাজ আছে।

তাহলে কিছু খেয়ে নিন—

আমার ক্ষিধে নেই—

কিছুই খাবেন না?

আমাকে বরং তুমি এক গ্লাস দুধ পাঠিয়ে দিও ঘরে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল তনিমা।

১

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল—বাইরে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টাধ্বনি হলো।

রাত দুটো।

সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন তনিমার নীলাদ্রির কথা মনে পড়ল।

নীলাদ্রি কি এখনো জেগে—সে রাত্রের মতো সিগ্রেট খাচ্ছে আর পায়চারি করছে!

তনিমা শয্যা থেকে উঠে পড়ল।

ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নাইটির উপরে—ঘাসের চপ্পল জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে বেডরুম থেকে বের হয়ে এলো তনিমা।

সমস্ত বাড়িটা একেবারে স্তব্ধ।

শুধু সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ের ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ রাত্রির স্তব্ধতায় একটা শব্দের প্রাণস্পন্দন তুলে চলেছে যেন।

নীলাদ্রির ঘরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়—দরজার eye দিয়ে ভিতরে উঁকি দেয়—

ঘরে আলো জ্বলছে।

নীলাদ্রিকে দেখা যাচ্ছে না—

কিন্তু মৃদুকণ্ঠে একটা আবৃত্তি শোনা যায়।

Our sincerest laughter
with some pain is farught
Our sweetest songes are thoese that tell of
saddest thought.

তনিমা বন্ধ দরজার গায়ে নক করল—

মিঃ চৌধুরী—

কে?

আমি তনিমা—

দরজা খুলে গেল—সামনেই দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি—হাতে তার রঙিন তরল পদার্থপূর্ণ একটি দামী ইটালীয়ান কাট্ গ্লাসের পানপাত্র—

একি তুমি বাড়ি যাওনি!

না।

চোখ দুটো যেন নীলাদ্রির বুজে আসতে চাইছে।

মাথার চুল সামান্য বিস্রস্ত—

শীতের রাত্রেও মুখটা যেন ঘামে চকচক করছে। মৃদু মৃদু টলছে যেন নীলাদ্রি।

গায়ের ড্রেসিং গাউনের দড়িটা ঝুলে পড়েছে কোমর থেকে।

এসো—নীলাদ্রি মৃদু গলায় তনিমাকে আহ্বান জানায়।

তনিমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

সামনেই কাচের সেণ্টার টেবিলের উপরে একটা প্রায় শূন্য হুইসকির বোতল—অ্যাসট্রে-ভর্তি পোড়া সিগ্রেট—

নীলাদ্রির দিকে তাকাল তনিমা।

তনিমা—

বলুন।

আচ্ছা ঐ কবিতাটা জানো ?

কোন্‌টা ?

> ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা,
> স্বর্গ, মর্ত্য আরাধ্যা, তুমি হে চিরবরেণ্যা—

হাতের গ্লাসটায় আবার একটা চুমুক দিল নীলাদ্রি।

হঠাৎ তনিমা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ করে—নীলাদ্রির হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিতে নিতে বলে, no—no more—you had enough—চলুন। শুতে চলুন—চলুন—।

Don't worry my dear—am drinking since am eighteen only—

চলুন, শোবেন—

কিন্তু ঘুম তো আমার আসবে না—

আসবে, চলুন—

শয্যার দিকে যেতে যেতে কতকটা যেন আপনমনেই বলে নীলাদ্রি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো তনিমা—বিলেত থেকে তিন বছর পর ফিরে এসে সত্যিই আমি গিয়েছিলাম—কেন যেন মনে হয়েছিল, হঠাৎ হয়ত আজো আমার জন্য সে অপেক্ষা করছে—

কার কথা বলছেন ?

শিউলী—

শিউলী! কে সে?

একটি মেয়ে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর তনিমা—আমি শুনেছিলাম—

কি শুনেছিলেন?

একটা চাকরের সঙ্গে সে নাকি সেখান থেকে চলে আসার মাস তিনেক পরই এক রাত্রে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। তারপর আর আমার কি করবার থাকতে পারে বল? Obviously I then completely washed off my hands. I forgot her—আমার জীবনের পাতা থেকে সে-অধ্যায়টা মুছে গেল—তারপর হঠাৎ আজ এত বছর পরে—I don't know how off my many years after—

শয্যার কাছে নিয়ে এসে তনিমা নীলাদ্রিকে বলে, শুয়ে পড়ুন তো এবার—

কিন্তু আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান তনিমা—আজ যে অপরাধের জন্য ওকে এসে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে—আজ যে ওর হাত দুটো হত্যার রক্তে কলঙ্কিত হয়েছে তার সবটুকু দায়িত্বই বুঝি ওর নয়—।

কই শুয়ে পড়ুন। রাত অনেক হয়েছে।

এবং আমার মনে হচ্ছে কেবলই ওকে চেনবার পর থেকে আজকের পর এই পরিণতির জন্য কি আমিও equally responsible নই; একটা নিষ্পাপ innocent মেয়ে তাকে যদি সেদিন আমি ঐভাবে নষ্ট না করতাম—বোস তনিমা—I must tell you everything—

না—আজ আর কোন কথা নয়—now you must sleep.

তনিমা কোন কথাই আর শোনে না নীলাদ্রির—তাকে একপ্রকার যেন জোর করেই শয্যায় শুইয়ে দেয়—

গায়ে লেপটা টেনে দেয়, আলোটা ঘরের নিভিয়ে দেয়।

ঘুমোন।

কিন্তু আমার যে তোমাকে সব কথা বলা হলো না, তনিমা—

কাল বলবেন, শুনবো—

কাল ?

হ্যাঁ—

বেশ। তাই ভাল। কালই বলবো—

নীলাদ্রি চোখ বুজল। তনিমা কিন্তু গেল না। মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল তারপর হাত বাড়িয়ে শায়িত নীলাদ্রির মাথার এলো-মেলো চুলগুলোতে আঙুল চালাতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে এক সময় যখন তনিমার মনে হলো নীলাদ্রি ঘুমিয়ে পড়েছে—তার লেপটা গায়ে টেনে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল—

১০

পরের দিন রাত্রে—

নীলাদ্রি তাব শোবাব ঘবে পায়চারি করছিল, তনিমা এসে ঘরে ঢুকল।

এসো তনিমা—আজ সব বলব তোমাকে—

আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন। তারপর শুনবো আপনার কথা।

No appetite—

ঘরেব একপাশে টেবিলের উপরে একটা অর্ধপূর্ণ হুইস্কির গ্লাস—পাশে একটা Old Smuggler-এর বেঁটে মোটা বোতল। সোডা সাইফন। তার পাশে একটা ক্যারাভ্যান-এর সিগ্রেট টিন।

হাতে জ্বলন্ত একটা সিগ্রেট।

বোস তুমি।

তনিমা একটা সোফায় বসল।

I don't know from where I should start. তারপর একটু থেমে গ্লাসটা তুলে একটা চুমুক দিল আবার নীলাদ্রি।

ঠিক আছে, কোর্ট থেকেই শুরু করি—

তনিমা চেয়ে থাকে নীলাদ্রির মুখের দিকে।

তুমি সেদিন যে কেসটার কথা বলছিলে না।

কোন্ কেসটা ?

ঐ যে আমার জুনিয়র অনিল সেন যে কেসটা হাতে নিয়েছে—

মানে ঐ বদ্রীপ্রসাদ আগরওয়ালার মার্ডার কেসটার কথা বলছেন?

হ্যাঁ—

কি হয়েছে সে কেসটার?

সেই মামলার আসামী—?

হ্যাঁ এক রূপোপজীবিনী—বারবনিতা শুনেছি—

ঐ চম্পাবাঈকে আমি চিনি—মানে চিনতে পেরেছি—

চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ—তবে চম্পাবাঈ হিসাবে নয়—because I never met her since she became চম্পাবাঈ! তার অনেক আগে থাকতেই ওকে আমি চিনি—

কি করে চিনলেন?

তনিমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলতে থাকে নীলাদ্রি, যেদিন ও চম্পাবাঈ ছিল না—একটি নিষ্পাপ সরল মেয়ে—তারপর একটু যেন থেমে বলে নীলাদ্রি, হয়ত চম্পাবাঈ না হলে ওকে কোন দিনই এমন করে হত্যার অপরাধে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হতো না আর হয়ত ওকে আজ চম্পাবাঈও হতে হতো না যদি না সেদিন এক যুবকের লালসার আগুনে ওকে দগ্ধ হতে হতো।

তনিমা নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি বলে চলে, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যদিও আজ সব কিছুই ওর বিরুদ্ধে—নিম্ন আদালত থেকেও চরম দণ্ডের প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাহলেও আমার strong convicition বদ্রীপ্রসাদকে ও হত্যা করেনি—করতে পারে না—আর আমাকে তাই চেষ্টা করতে হবে ওকে বাঁচাবার—yes—I must save her—

আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না, মিঃ চৌধুরী। আপনিই তো সেদিন বলেছিলেন, ওর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে করে ওকে বাঁচানো আজ সত্যিই দুঃসাধ্য—

ঠিক। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আজ, ও হত্যা করতে পারে না অমন ভাবে কাউকে। সবটাই তো হয়ত ওর বিরুদ্ধে সাজানো

হয়েছে কিংবা বলতে পারা যায়, ওকে চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

কিন্তু—

আমার দীর্ঘ দিনের আইন ও আদালতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি আর দেখেছি, কত সময় সত্যিকারের অপধারী না হয়েও তাকে অপরাধী হতে হয় প্রমাণের আইনের নাগপাশে পড়ে। তাই আমি কি স্থিব করেছি, জান।

কি?

কেসটা আমি হাতে নেবো। আমাকে প্রমাণ করতেই হবে, ও হত্যাকারিণী নয়। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে যেমন করেই হোক—

কি জানতে চান?

ওর এই কয় বছরের অতীত ইতিহাসটা, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না, তা কেমন করে সম্ভব হবে। এই কয়দিন কেবলই কথাটা ভাবছি কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাইনি। কিন্তু একটু আগে পথ একটা আছে, মনে হলো—

পথ।

হ্যাঁ—ওর সঙ্গে দেখা করব—

কি বলছেন আপনি! একটা ফাঁসীর আসামী—কেবল তাই নয় রূপোপজীবিনী বারবনিতা, তার সঙ্গে গিয়ে জেলে আপনি দেখা করবেন!

করতেই হবে।

আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

মাথা খাবাপ?

নিশ্চয়ই—আপনি ভুলে যাবেন না—আপনি বর্তমানে কি আর ও কে। কি ওর পরিচয়—কোন এক সুদূর অতীতে ওর সঙ্গে আপনার কোন রকম আলাপ বা পরিচয় থাকলেও সে-কথা আজ আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে—

ভুলে যেতে হবে?

হ্যাঁ—ভুলে যাবেন না, তার পরিচয় আজ একজন দেহ-পসারিণী—নর্তকী—বাঈজী—শুধু তাই নয়, চরম ঘৃণ্য হত্যার অপরাধে

সে আজ বিচারের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর আপনি —

আমি—

আপনি সমাজের একজন সর্বজনপরিচিত অভিজাত ব্যক্তি—বিশিষ্ট পরিচয়ের একজন নাগরিক—কেবল তাই নয়, আসন্নবর্তী লোকসভার ইলেকশনের আপনি একজন প্রার্থী—

জানি—সব জানি—তবু—

আপনার আসন্নবর্তী ইলেকশনে জয় যে সুনিশ্চিত, এটা আপনার যেন জানা, আমরাও তা জানি—তারপর হয়ত সেণ্ট্রাল ক্যাবিনেটের একজন মিনিস্টার—

তোমার কোন যুক্তিই আমি অস্বীকার করছি না তনিমা—কিন্তু ওকেও তো আমি অস্বীকার করতে পারছি না—

করতে হবেই অস্বীকার। তাছাড়া মানুষের প্রথম জীবনে কত সময় কত কি ঘটে—সে সব কে মনে রাখে—বিশেষ করে আপনাদের মত মানুষের পক্ষে তো—সেটা উচিতও নয়—

কিন্তু আমার বিবেক কি বলছে জান? এ শুধু অন্যায় নয়, পাপ। তাছাড়া আমি যে বুঝতে পারছি, আজ ওর আপনার বলতে দুনিয়ায় আর কেউই নেই—না, না—আজ ওর পাশে আমাকে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে—

কিন্তু আপনার ভুলও তো হতে পারে।—এবার যেন কতকটা নিরুপায়ের মতই তনিমা বলে।

ভুল?

হ্যাঁ—বলছেন সেও তো অনেক বছর আগেকার কথা। হয়তো এ সে আদৌ নয়—ঐ মেয়েটি অন্য কেউ। আপনার চেনা মেয়েটি নয়।

না—ভুল আমার হয়নি—আমি চিনেছি ওকে ঠিকই—ও সেই-ই—

মানলাম হয়তো সেই! তবু আজ আপনি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। আপনার সেই sympathyকে জানবেন, আজকের যারা আপনার চারপাশে রয়েছে তারা কেউ ক্ষমার চোখে দেখবে না—

নীলাদ্রি অস্থির চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে

আর অসহিষ্ণুভাবে নিজের মাথার চুলগুলো টানতে থাকে।

কেন, কেন দেখবে না—কেন বুঝতে চাইবে না আমিও দোষে-গুণে একটা মানুষ—সবারই মত একজন মানুষ—

না তারা তা একবারও ভাববে না—

কিন্তু কেন? কেন বলতে পারো—

কারণ সেটাই স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক!

হ্যাঁ- -কারণ, কোন একজন মানুষকে যখন সকলে মিলে বিশেষ একটা পরিচয় দিয়ে দাঁড় করায় যেন তার নিজস্ব বলে আর কিছু থাকে না, থাকতে পারে না।

তার চাইতে আপনি তার কেসটার ব্যাপারে সাহায্য করতে চান, ব্যারিস্টার সেনকেই করুন—নিজের হাতে কেসটা আপনি নিতে চান, নিন—কিন্তু তার সঙ্গে কিছুতেই আপনি দেখা করতে পারবেন না জেলে গিয়ে—

অসহায় দৃষ্টিতে নীলাদ্রি তনিমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—

কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো একটা কথা আইনের দৃষ্টি দিয়ে আমি বুঝতে পারছি, যেভাবে মেয়েটির দুর্ভাগ্য ওকে চারপাশ থেকে টেনে ধরেছে—যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আজ ওর বিরুদ্ধে সংগৃহীত হয়েছে, কোন আইনজ্ঞের সাধ্য নেই, চরম দণ্ডের হাত থেকে আজ তাকে ফিরিয়ে আনে। She is doomed—কিন্তু আমার মন বলছে, তা সত্য নয়—আর এটা যে সত্য নয় সেটা প্রমাণ করতে হলে আমাকে নিজেকেই দাঁড়াতে হবে, আমাকে জানতেও হবে ওর এই কবছরের অতীত ইতিহাসটা। জানতে পারলে তার মধ্যেই এমন কিছু সূত্র আমি পাবো, যার দ্বারা ওকে আজ চরম দণ্ডের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে—

বুঝতে পারছেন না কেন সহজ কথাটা, আপনার মত একজন নামকরা বড় ব্যারিস্টার বিনি পয়সায় আজকে ওই কেসটা হাতে নিলে কেউ সেটা মনে করবে না, নিছক সেটা একটা দরদের বা সহানুভূতির ব্যাপার—ভাববে, কোথাও কোন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

তা হয়ত ভাববে—

শুধু তাই নয়—তারপর জেলে গিয়ে যদি ওর সঙ্গে আপনি দেখা করেন, সেটা আপনার শত্রুরা এই ইলেকশনের মুখে ফলাও করে প্রচার করবে নানা ইঙ্গিত দিয়ে—না, না—নিজের ভবিষ্যৎকে আজ আপনি ধ্বংস করতে পারেন না। It is nothing but suicide.

কিন্তু গণিকা—নর্তকী—বাঈজী আজ সে কার জন্য—হয়ত—হয়ত সে আমারই জন্য—

আপনার জন্য ?

হ্যাঁ—হয়ত আমারই জন্য !

আমি আপনার কথা মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না—ঐ চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

সম্পর্ক আমার সঙ্গে, তাই না ?—Then I must go back to my past—when I was a young man—just fresh from University—

তনিমা চেয়ে থাকে নীলাদ্রির মুখের দিকে।

হ্যাঁ তনিমা—তুমি তো জান, বিরাট ধনী পিতার একমাত্র সন্তান আমি—ছোটবেলা মাকে হাবাই—আমার বাবাই ছিলেন একাধারে মা ও বাবা। যখন ম্যাট্রিক দেবো, বাবাও মারা গেলেন। বড়লোকের ছেলে—অজস্র পয়সা—রূপ-যৌবন--ভেবেছি তখন দুনিয়াটা আমারই—হাতের মুঠোর মধ্যে। আর তাতেই হয়ে উঠেছিলাম উচ্ছৃংখল একান্ত স্বেচ্ছাচারী। সেই উচ্ছৃংখল ও স্বেচ্ছাচারিতার যে সব চাইতে বড় vice সেই woman স্ত্রীলোকের তখন পরিচয় আমার কাছে একটি মাত্রই—তারা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী—beauty and youth of woman is only for enjoyment—ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে এলো আমার জীবনে। নীলাদ্রি চৌধুরী একটু থামল যেন, নিজেকে একটু গুছিয়ে নিল—তারপর আবার বলতে শুরু করে, চম্পা নয়, সে হচ্ছে শিউলী ! ফুলের মত সুন্দর সারাটা দেহে কমনীয় যৌবন যেন উথলে উঠেছে—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে আমার যেন আগুন জ্বলে উঠল—

১১

সবে এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে নীলাদ্রি।

সামনে কয়েক মাসের অবসর—

বিলেতে পড়তে যাবার তোড়জোড় চলছে। ঐ সময় এলো তার পিসিমার কাছ থেকে সাদর আমন্ত্রণ—

জমিদারী প্রথা তখনো বিলুপ্ত হয়নি—জমিদারদের তখনো প্রচণ্ড প্রতাপ—তাদের রাজ্যে তারাই একমাত্র অধীশ্বর—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

পিসিমা বিধবা—বয়স হয়েছে—পিসেমশাইয়ের অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল। পিসিমার কোন সন্তানাদি ছিল না।

একটা রাত্রির পথ।

স্টেশন থেকে নেমে মাইল দুই গাড়িতে যেতে হয়। জায়গাটায় পাহাড় অরণ্য সবই আছে—মনোরম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ!

নীলাদ্রি ভাবল, মন্দ কি—একটা মাস পিসিমার ওখানে কাটিয়ে আসা যাক। সে পিসিমাকে চিঠি লিখে দিল--শনিবার শেষ রাত্রে পৌঁছচ্ছি, স্টেশনে গাড়ি পাঠিও।

সময়টা যদিও প্রায় শীতের শেষ।

শেষ রাত্রের দিকে একটু শীত-শীত তবু বোধ হয়। ঘোর-ঘোর অন্ধকারে ট্রেনটা এসে থামল স্টেশনে।

গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন বৃদ্ধ সরকার মশাই প্রফুল্লবাবু।

সৌদামিনী দেবী—নীলাদ্রির পিসিমার বিষয়-সম্পত্তি প্রফুল্লবাবুই দেখাশোনা করেন তার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এখনও।

দীর্ঘদিন স্টেটে আছেন—সৌদামিনী দেবীর স্বামীর আমল থেকেই—

সাদা ঘোড়ার জুড়ি-গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন প্রফুল্লবাবু।

নীলাদ্রি খুব ছোটবেলায় একবার তার সঙ্গে পিসিমার ওখানে এসেছিল দিন দশেকের জন্য।

তারপর দীর্ঘ ক'বছর পরে এই দ্বিতীয়বার আগমন।

তাহলেও প্রফুল্লবাবুকে সে চিনতে পারে।

গাড়ির বুড়ো কোচোয়ান তখন নেই—নতুন কোচোয়ান ইদ্রিস। সে সেলাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

ওরা দুজনে উঠে বসে।

দু-আড়াই মাইল পথ—আধঘন্টার মধ্যেই পেঁছে যায়।

বিরাট জায়গা জুড়ে প্রাসাদতুল্য বাড়ি। চারপাশে বাগান ও দীঘি—চাকরদের থাকবার আস্তানা।

জুড়ি-গাড়ি যখন গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করল, ভোরের আলো তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিরাট হলঘরের মত একটা ঘর—তার পরই চওড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি—সেকেলে সব বনিয়াদী আসবাবপত্র।

বড় বড় অয়েল-পেনটিং—বেশী ভাগই নগ্ন নারীমূর্তির।

মাথার উপরে ঝাড়লণ্ঠন।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বয়েস হলেও এখনো স্বাস্থ্য অটুট—

এককালে যে নামকরা রূপসী ছিলেন, প্রৌঢ়া বয়েসেও তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

পরনে ধবধবে গরদের থান।

নিরাভরণা—

তবু যেন দেখলে আপনা থেকেই মাথা নুয়ে আসে।

মহিলা যেমন রাশভারী তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না।

নত হয়ে পিসিমার পায়ের ধুলো নিতেই পিসিমা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন, বেঁচে থাক বাবা—রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো—

কষ্ট আবার কি—ভারী তো জার্নি—

পিসিমা ডাকেন, কেষ্ট—অ কেষ্ট—

বেঁটেখাটো কালো কুচকুচে গাত্রবর্ণ ষণ্ডাগণ্ডা একটা লোক এসে দাঁড়াল—ডাকছেন রানীমা—

মাথার চুল ঘন কুঞ্চিত—পুরু ঠোঁট—চোখ দুটো গোল গোল রক্তবর্ণ।

হ্যাঁ—দাদাবাবুর থাকবার জন্যে যে দোতলার দক্ষিণের বড় ঘরটা

ঠিক করে রেখেছি, সেখানে নিয়ে যা—আর শিউলীকে বল, ওকে চা করে দিয়ে আসতে—কলকাতার বাবু, এখুনিই তো চায়ের তেষ্টা পাবে।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না তো পিসিমা—নীলাদ্রি বলে।

না—ব্যস্ত হইনি—তুই যা, চা খেয়ে বিশ্রাম কর—আমি পুজোটা সেরে আসি।

পিসিমা চলে গেলেন।

কেষ্ট বলে, চলুন দাদাবাবু—

চল।

দুজনে বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে দক্ষিণের মহলে নীলাদ্রির জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে।

লম্বা টানা বারান্দা—

মধ্যে মধ্যে দেওয়ালগিরি।

গোল গোল বিরাট থাম—উপরে চমৎকার পঙ্খের কাজ করা।

অদ্ভুত স্তব্ধ যেন বাড়িটা।

স্তব্ধ—শান্ত।

দক্ষিণ মহল অর্থাৎ বাড়ির পশ্চাৎদিক—বেশ বড় সাইজের ঘর—যে ঘরে নীলাদ্রির থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ভাইপো শহরে থাকে, তাই পিসিমা তার আরামের সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন।

নীলাদ্রি ঘরে ঢুকে প্রথমেই ঘরের সমস্ত জানলাগুলো খুলে দিল, দক্ষিণ দিকেই উদ্যান ও কাক-চক্ষু জল এক বিরাট দীঘি চোখে পড়ল।

সবুজ-প্রাচুর্যে নীলাদ্রির চোখের দৃষ্টি যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায়—প্রসন্নতায় মনটা ভরে ওঠে।

একজন ভৃত্য এসে নীলাদ্রির সুটকেস দুটো ঘরে রেখে গেল।

নীলাদ্রি জানলার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে।

আপনার চা—

কথা নয়, হঠাৎ যেন পিছনে কে গানের সুরে গেয়ে উঠল।

ফিরে তাকাল নীলাদ্রি।

চোখের দৃষ্টি যেন তার আর ফেরে না। শুধু সুন্দরই নয়,

অপূর্ব।

পনের ষোল বছরের একটি তরুণী। সরু পাতলা চেহারা, কিন্তু সদ্য-আসা যৌবন যেন সারা দেহে টলমল করছে।

কাঁচা সোনার মত রং।

ছোট কপাল, নাক চিবুক পাতলা, দুটি ঠোঁট যেন কোন দক্ষ শিল্পীর তুলির টানে আঁকা হয়েছে।

পরনে একটা নীলাম্বরী শাড়ি—বুকের উপর দিয়ে ঘের দিয়ে কোমরে জড়ানো।

মাখনে গড়া দুটি মণিবন্ধে দুটি সোনার বালা।

কানে দুটি লাল পাথরের দুল।

টাইট করে টেনে চুল খোঁপা করে বাঁধা।

গায়ের হাফহাত জামা থেকে পীনোন্নত বক্ষ যৌবনকে যেন এঁটে রাখতে পারছে না।

নীলাদ্রি যেমন অপলক মুগ্ধ বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও তেমনি চেয়ে ছিল পলকহারা দৃষ্টিতে নীলাদ্রির দিকে।

হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ।

নীলাদ্রির যেন চমক ভাঙে—সে দু পা এগিয়ে এসে মেয়েটির হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে গিয়ে ইচ্ছা করেই মেয়েটির চাঁপার কলির মত আঙুলের স্পর্শ চুরি করে নেয়—

সারা দেহে যেন একটা পুলকের বিদ্যুৎশিহরণ খেলে যায়।

মেয়েটিও যেন নীলদ্রির স্পর্শে কেঁপে ওঠে।

মেয়েটি ফিরে যাচ্ছিল, নীলাদ্রি ডাকল, কি নাম তোমার?

শিউলী—

চোখ নামায় শিউলী।

শিউলী আবার যাবার জন্য পা বাড়ায়। নীলাদ্রি আবার বাধা দেয়, দাঁড়াও না—

আবার দাঁড়াল শিউলী।

এখানেই বুঝি থাক তুমি?

হ্যাঁ—

পিসিমার কাছে?

হুঁ।

কতোদিন আছো?

খুব ছোটবেলায় মা-বাবা মারা যাবার পরই মা আমাকে এখানে নিয়ে এসে তাঁর কাছে রেখেছেন।

কি নামটা যেন বললে তোমার—

শিউলী—

সুন্দর নাম। আমি কে জান?

ও ঘাড় হেলিয়ে জানায়, সে জানে।

আমার নাম জান?

ও মাথা নাড়ল, জানে না—

নীলাদ্রি।

আমি যাই—

দাঁড়াও না—ব্যস্ত কি?

মার পুজো হয়ে গেছে বোধহয়, তাঁর সঙ্গে এবারে আমাকে বেরুতে হবে—

বেরুতে হবে—কোথায়?

মা বেড়াতে বেরুবেন—তাঁর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে—

রোজ বুঝি এই সময় পিসিমার সঙ্গে যাও—

হুঁ।

আর কি করতে হয় তোমাকে এখানে?

সন্ধ্যার দিকে মাকে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাতে হয়—তাঁর চিঠিপত্র থাকলে সেগুলো পড়ে মার হয়ে জবাব দিতে হয়—

নীলাদ্রি কৌতুকভরা কণ্ঠে বলে, পিসিমার প্রাইভেট সেক্রেটারী তাহলে একরকম বল তুমি।

ও মৃদু হাসে।

মাথাটা সলজ্জ ভঙ্গিতে নীচু করে।

নীলাদ্রির মনে পড়ে পিসিমা সৌদামিনী দেবীর খুব ছোট বয়েসে বিবাহ হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে যখন তাঁর খেলাঘরের খেলাই বুঝি শেষ হয়নি।

যদিও পিসেমশাই ছিলেন ধনীর একমাত্র ছেলে, তা সত্ত্বেও লেখা-পড়ায় খুব ভাল ছিলেন বরাবরই। তাছাড়া তাঁর গান বাজনা ছবি

আঁকারও নেশা ছিল—পিসিমাকে হয়ত নিজের মত করেই গড়ে নিয়েছিলেন বিবাহের পর।

শিউলী বলে, আমি এবারে যাই—

কি জানি কেন, নীলাদ্রির শিউলীকে কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না, অথচ আটকে রাখবেই বা কি করে।

তাই মৃদু হেসে বলে—কিন্তু আমার যে আর এক কাপ চায়ের দরকার—

আর এক কাপ—

হ্যাঁ—পিপাসাই তো মিটল না।

এনে দিচ্ছি—

খুব জলদি চাই কিন্তু—নচেৎ আমি গিয়ে ঠিক তোমার রন্ধন-শালায় হাজির হবো, জেনো।

আমি এখুনি আনছি চা করে—

শিউলী ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিরাট একটা সেকেলে আরামকেদারা ছিল ঘরের মধ্যে, নীলাদ্রি সেটার উপর গা ঢেলে দিয়ে চোখ বুজে গুনগুন করে গান ধরে—

একটু পরে সৌদামিনী দেবী এসে ঘরে ঢোকেন—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে শিউলী।

নীলু—

কে—পিসিমা—

এত চা খাস কেন বল তো, ঐ জন্যেই তো তোদের ক্ষিধে হয় না—

শিউলী চায়ের কাপটা নীলাদ্রির হাতে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নীলাদ্রি বলে, ভয় নেই তোমার পিসিমা—খাবো যখন দেখবে—

কিন্তু চায়ের তৃষ্ণা শিউলী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আর নীলাদ্রির ছিল না।

গোটা দুই চুমুক দিয়ে পুরো কাপটাই একপাশে নামিয়ে রাখে নীলাদ্রি।

ঐ মেয়েটি কে পিসিমা—আগেরবার যখন এখানে এসেছিলাম,

ওকে কই দেখিনি তো—

না—ও তো এই বছর আষ্টেক হলো আমার কাছে আছে—সঞ্জীব বোস আমাদের এক প্রজা ছিল—লোকটা যেমন মাতাল তেমনি অকর্মণ্য ও চরিত্রহীন—ও তারই মেয়ে—

ওর মা-বাবা বুঝি বেঁচে নেই—

না—সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার—

কি রকম ?

নিজে মাতাল চরিত্রহীন ছিল অথচ নিরীহ বৌটাকে সর্বদা সন্দেহ করত। শেষটায় একদিন কি হয়েছিল, কে জানে, বৌটাকে গলা টিপে মেরে নিজে পালায়—

বল কি ! তারপর—।

কিন্তু পালাতে পারে না, শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে ধরা পড়ে—বিচারে ফাঁসি হয়—মেয়েটাকে দেখবার কেউ নেই—বাচ্চা সাত-আট বছরের মেয়ে ও তখন—আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল তারাও মুখ ফেরাল—কোথায় যায় মেয়েটা—আমিই নিয়ে এলাম আমার কাছে। সেই থেকে আমার কাছেই আছে। স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম কিন্তু কিছুদূর পড়ে আর পড়ল না। ভাবছি, মেয়েটার একটা বিয়েথা দিয়ে সংসার পাতিয়ে দেবো। এখানে তো ওর বাপের পরিচয়ের জন্যে কেউ বিয়ে করবে না ওকে—তা হ্যাঁরে—তোদের কলকাতায় কত ছেলে আছে শুনি, তেমন কোন ছেলের সন্ধান মানে সদ্‌বংশের লেখাপড়াজানা কোন গরীবের ঘরের ছেলের সন্ধান করতে পারলে আমায় জানাস তো বাবা।

বেশ তো—জানাবো।

হ্যাঁ—দেখিস—মেয়েটাকে এই বাড়িতে আর রাখতে ভরসা হয় না—রাক্ষুসীর যত দিন যাচ্ছে, রূপ আর যৌবন যেন ফেটে বেরুচ্ছে—

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে।

বাড়ির পিছনে যে বাগানটা—নীলাদ্রি একা একা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

পিসিমা দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। বাড়ির দাসদাসীরাও সব যে যার

ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে নীলাদ্রি।

কোথা থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে।

কে যেন গাইছে—

গানের প্রথম লাইনটা তার কানে আসে।

কানু কহে রাই কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই—

কে—কে গান গায়—এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নীলাদ্রির নজরে পড়ে বাগানের বিরাট একটা পেয়ারা গাছের ডালে দোলনা বাঁধা—সেই দোলনায় দোল খেতে খেতে আপনমনে গাইছে শিউলী—

নীলাদ্রি এগিয়ে যায়—

শিউলী গায়—

(আমি) তোমার প্রেমের কিই বা জানি।
কিবা রাখালিয়া মতি
কি জানি পিরিতি
প্রেমের পসরা তুই—

সহসা গান শেষ হতেই শিউলীর নজর পড়ে নীলাদ্রির উপরে। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি ওর দিকেই তাকিয়ে। নীলাদ্রি যেন দু চোখ মেলে ওকে দেখছে।

লজ্জা পেয়ে যায় শিউলী। ঝুপ করে দোলনা থেকে লাফিয়ে পড়ে নীলাদ্রির পাশ কাটিয়ে ছুটে পালাতে যাবে অকস্মাৎ দু হাত বাড়িয়ে নীলাদ্রি ওর পলায়নপর দেহটা ধরে ফেলে।

না না—ছাড়ুন ছাড়ুন—নীলাদ্রির হাতের বাঁধন খুলে যাবার চেষ্টা করতে থাকে শিউলী।

না, ছাড়বো না—

আঃ—ছাড়ুন ছাড়ুন—

নীলাদ্রি ছেড়ে দেয় শিউলীকে। সঙ্গে সঙ্গে ও ছুটে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নীলাদ্রি বলতে থাকে, আজ মিথ্যা বলবো না তোমাকে তনিমা,

তখন পর্যন্ত কোন মেয়েছেলে আমার কাছে ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শিউলীর সেই রূপ আর উদ্ভিন্ন যৌবন যেন বুকের মধ্যে আমার আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আমি যেন শিউলীকে পাওয়ার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠলাম। কিন্তু শিউলী বোধহয় ব্যাপারটা সবটা না জানলেও কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল। সে আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগল। সামনে এলেও আমার সরাসরি—নাগালের অনেক দূরে দূরে থাকত।

১২

নীলাদ্রি বলতে থাকে, যেন শিউলী সেদিন বুকের মধ্যে তৃষ্ণার আগুন জেবলে দিয়েছিল—আমার—যত সে আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল ততই যেন তাকে পাওয়ার জন্য ছটফট করছিলাম।

সত্যিই নীলাদ্রির বুকের মধ্যে তখন আগুন জ্বলছে।

অথচ চার-পাঁচদিন নীলাদ্রি শিউলীর আর যেন ছায়াও দেখতে পায় না।

চাও দিতে আসে না শিউলী আর তাকে।

চা নিয়ে আসে কেষ্ট।

ছটফট করে নীলাদ্রি কিন্তু না পারে, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে কিছু, না পারে শিউলীকে ডাকতে।

আর ঐ কেষ্টটার দিকে তাকালেই:কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে নীলাদ্রির।

নীলাদ্রি শুনেছিল—শিউলী সন্ধ্যার দিকে পিসিমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনায়—

একদিন নীলাদ্রি সেই আসরেই গিয়ে হাজির হলো অবশেষে।

পিসিমার শয়নঘরে।

বিরাট একটা পালঙ্কের উপর শুয়ে আছেন সৌদামিনী আর শেজবাতির আলোয় মেঝেতে মাদুর পেতে রামায়ণটা খুলে পড়ছে শিউলী।

সুর করে সুললিত কণ্ঠে রামায়ণ পাঠ করছে শিউলী।

নীলাদ্রিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সৌদামিনী ওর দিকে তাকান।

শিউলী কিন্তু দেখতে পায়নি নীলাদ্রিকে, যে যেমন পড়ছিল, পড়ে চলে।

পিসিমা বলেন, নীলু—আয় বোস। বেড়াতে যাসনি আজ?

গিয়েছিলাম—

নীলাদ্রি পালঙ্কের উপরই পিসিমার পায়ের কাছে বসল।

নীলাদ্রির গলার সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শিউলী বন্ধ করে দিয়েছিল রামায়ণ পাঠ। মাথা নিচু করে বসে ছিল। গায়ের কাপড়টা একটু টেনে দেয় ভাল করে।

শিউলীর দিকে তাকিয়ে সৌদামিনী বলল, আজ থাক—তুই এখন যা—

শিউলী রামায়ণটা বন্ধ করে সেটা তাকের উপর তুলে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে যায় নিঃশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে নীলাদ্রিরও তার পিসিমার সঙ্গে কথা বলার সমস্ত উৎসাহ যেন নির্বাপিত হয়ে যায়।

তারও ইচ্ছা করে উঠে যেতে, কিন্তু পারে না।

পিসিমা শুধান, কতদূর বেড়াতে গিয়েছিলি রে?

সেই পাহাড়টা পর্যন্ত—

উপরে উঠেছিলি?

না—

উপরে একটা মন্দির আছে—একদিন যাস—উপরে উঠলে চারদিক ভারি চমৎকার দেখায়।

তুমি বুঝি উঠেছিলে?

হ্যাঁ—তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে একদিন উঠেছিলাম। অনেক বছর আগে—

আমি উঠি পিসিমা—হেঁটে এসে বড় ক্লান্ত লাগছে –

যা তাহলে বিশ্রাম করগে—

নীলাদ্রি যেন উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

বাইরে চাঁদ উঠেছে—চাঁদের আলো দোতলার বারান্দায় এসে পড়েছে।

এদিক ওদিক তাকায়, যদি শিউলীকে দেখতে পায়, কিন্তু কোথায়ও তাকে দেখতে পায় না। মনে মনে রাগই হয় যেন নীলাদ্রির

—মেয়েটা ভাবছে কি।

নীলাদ্রি নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে আবার অকস্মাৎ দীঘির ঘাটে নীলাদ্রি শিউলীর দেখা পায়।

ঘুরে বেড়াচ্ছিল নীলাদ্রি বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ছায়ায়—

কোথায় একটা কোকিল ডেকে ওঠে, কু-কু-কু—

সঙ্গে সঙ্গে কোমল নারীকণ্ঠে অনুকরণ ভেসে আসে, কু-কু-কু—

এদিক ওদিক তাকায় নীলাদ্রি।

তার পরই নজরে পড়ে দীঘির জলে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে কোকিল-টাকে ভেঙাচ্ছে শিউলী।

কু-কু-কু—

মৃণালের মত দুটি বাহু দিয়ে জলে ঢেউ তুলছে শিউলী আপন খেয়াল-খুশিতে।

পিসিমা সেদিন গৃহে ছিলেন না। নীলাদ্রি জানত—মাইল দশেক দূরে কোথায় এক জাগ্রত মূর্তি আছে তার পূজা দিতে গিয়েছেন।

নীলাদ্রি একবার থামল—একটু ইতস্ততঃ করল, তারপর এগিয়ে যায় সোজা দীঘির বানার দিকে।

শিউলীর স্নান হয়ে গিয়েছিল—সে উঠে আসছে, ভিজে শাড়ি সর্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে—যৌবনপুষ্ট দেহের প্রতিটি ভাঁজ প্রতিটি রেখা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এলো চুল—

নীলাদ্রির চোখের দৃষ্টি যেন আর ফেরে না।

সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে আচমকা শিউলীর নজরে পড়ে গেল সামনে তার নীলাদ্রি—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সে।

কয়েকটা মুহূর্ত।

তারপরই যথাসম্ভব নিজের দেহকে সংকুচিত করে শিউলী বলে, যেতে দিন—

আস না কেন আমার কাছে?

শিউলী নীরব।

আমার কথার জবাব না দিলে যেতে দেবো না—

শিউলী নীরব তবু। বোঝা যায় সে বিরক্ত হচ্ছে।

ক'দিন দেখতে পাইনি কেন? আস না কেন আমার কাছে?

ও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তখনো।

মাথাটা যথাসম্ভব নীচু করে দাঁড়িয়ে শিউলী। ভিজে শাড়ি থেকে টুপটুপ করে দীঘির রানার উপরে জল ঝরে পড়ছে।

যেতে দিন—

যতক্ষণ না আমার কথার জবাব দিচ্ছ, ততক্ষণ নয়—

অকস্মাৎ ওর দুচোখের কোল জলে ঝাপসা হয়ে যায়—জলে ভেজা অসহায় দুটি চোখের দৃষ্টি নীলাদ্রির দিকে তুলে কান্না-ঝরা গলায় বলে, কেন আপনি আমার সঙ্গে এমন করছেন—

কি করলাম আমি তোমার সঙ্গে—

আমি গরীব—আপনার পিসিমার আশ্রিত বলেই কি আমার কোন সম্ভ্রম নেই—ইজ্জত নেই—

সহসা যেন একটা চাবুক এসে পড়ল নীলাদ্রিব মুখের উপরে। কয়দিন ধরে শিউলীর অদর্শনে মনের মধ্যে যে তৃষ্ণাটা জেগে উঠেছিল তারই অন্ধ আবেগে শিউলীর পথ রোধ করে সে দাঁড়িয়েছিল—

শিউলীর কথায় সমস্ত পরিস্থিতির নির্লজ্জতাটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি শিউলীর পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলে, যাও—তুমি—

শিউলী আর দাঁড়ায় না—চলে যায়।

দুটো দিন তারপরে নীলাদ্রি আর শিউলীর ছায়াও দেখতে পায় না। মনের মধ্যে সে ছটফট করতে থাকে।

দিন তিনেক পরে—দুপুর বেলা আড়াইটে নাগাদ চা খাওয়া নীলাদ্রির বরাবরের অভ্যাস।

গত কয়েক দিন কেষ্টই চা দিয়ে যাচ্ছিল।

নীলাদ্রি ঘরের মধ্যে আরাম-চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিল, এমন সময় শিউলী এক কাপ চা হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল শিউলী—নীলাদ্রি ডাকে, শিউলী।

শিউলী মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

নীলাদ্রি কেদারা থেকে উঠে ওর সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়।

শিউলী।

শিউলী কোন সাড়া দেয় না।

নীলাদ্রি ওর দুই কাঁধের উপর দুটো হাত রাখে, শিউলী।

শিউলী, মাথা নীচু করেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

শিউলী, মুখ তোল। তাকাও আমার দিকে, কই তাকাও—

শিউলী মুখ তুলল।

দু চোখে তার জল টলটল করছে।

সেদিনকার আমার ব্যবহারের জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা করো শিউলী। বিশ্বাস করো—ইচ্ছা করে তোমায় সেদিন আমি কোন রকম অপমান করিনি। তুমি বিশ্বাস করো, প্রথম যেদিন তোমায় আমি দেখি আমার দু'চোখ যেন ভরে গেল—মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি আমি। আমি—আমি তোমাকে ভালবেসেছি শিউলী—সত্যিই তোমাকে আমি ভালবেসেছি। এ কয়দিন একটিবারও তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমি কি যে কষ্ট পেয়েছি তুমি যদি জানতে—

আপনাদের আশ্রিত আমি—কেউ নেই আমার—যা খুশি তাই আপনি বলতে পারেন—সেদিনও ঐ কথা বলেছেন, আজো বলছেন।

কেন তুমি বার বার ঐ কথা বলছো শিউলী, কেন—কেন তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না—

বিশ্বাস করো, সেদিনও তোমাকে আমি অপমান করতে চাইনি বা কোন রকম বে-ইজ্জত করতে চাইনি—আর আজও চাই না—

শিউলীর দুচোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

নীলাদ্রি ওর কাঁধের উপর থেকে হাত নামিয়ে নেয়, বলে, জানি না তুমি কি হলে বিশ্বাস করবে—ঠিক আছে আর তোমাকে আমি কখনো কিছু বলবো না, যাও তুমি—

নীলাদ্রি সরে দাঁড়াল।

শিউলী ধীরে ধীরে নীলাদ্রির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

নীলাদ্রি হঠাৎ বলে, ঠিক আছে তুমি যখন মনে করেছো কেবলই যে তোমাকে আমি পীড়ন করছি, কালই আমি চলে যাবো—

শিউলী থমকে দাঁড়ায়, ভীতত্রস্ত দৃষ্টিতে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, না—না আপনি যাবেন না—মা—হয়ত ভাববেন—

পিসিমা ভাবলেই বা কি করবো, যেতে আমাকে হবেই—

না, না—

তাহলে বল, আমার কাছ থেকে তুমি আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে না—

বেড়াবো না।

ঠিক তো?

হ্যাঁ—

শিউলী অতঃপর ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়।

নীলাদ্রি চিৎকার করে বলে অপসৃত শিউলীকে সম্বোধন করে, আজ বিকেলের দিকে দীঘির ঘাটে আমি অপেক্ষা করবো, তুমি এসো—আমি অপেক্ষা করবো।

কোন সাড়া দিল না শিউলী।

বিকেল।

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হবার পর শিউলী এলো দীঘির ঘাটে—যখন প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফিরে যাওয়ার জন্য নীলাদ্রি—তখন।

বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল। চাঁদের আলোয় আকাশ ও প্রকৃতি তখন যেন ভেসে যাচ্ছে।

এসেছো—এসো—নীলাদ্রি সামনে এগিয়ে যায়।

ও নীলাদ্রির আহ্বানে কোন সাড়া দেয় না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

নীলাদ্রি এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে—শিউলীর দেহটা যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল।

নীলাদ্রি ওর হাতটা ধরে এনে দীঘির রানার ওপর বসাল ওকে, বোস—

নিজেও পাশে বসল।

ঘড়িতে রাত সোয়া আটটা। ভাবছিলাম, তুমি বোধ হয় আর এলে না।

শিউলী চুপচাপ বসে থাকে।

কি হলো, কথা বলছো না যে?

শিউলী তবু নীরব।

কথা বলছো না তো?

কি বলবো!

যা খুশি তোমার বল—শুধু কথা বল!

কেন ডেকেছেন আমাকে?

কেন ডেকেছি, বুঝতে পারছো না! শিউলী—নীলাদ্রি ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

বললে নীলাদ্রি, শিউলী, সত্যিই কি তুমি আমাকে এখনো বিশ্বাস করতে পারছো না?

যা অসম্ভব তা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না—মৃদু গলায় শিউলী জবাব দেয়।

কি অসম্ভব –তোমাকে আমার ভালবাসা?

হ্যাঁ—

কেন—

কে আমি—কি আমার পরিচয়! স্ত্রী-হত্যাকারী এক খুনী বাপের মেয়ে আমি—পরের দয়ায় বেঁচে আছি—তা ছাড়া কি আছে আমার—কোন পরিচয় নেই, শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নেই—আর আপনি—

কি আমি—

কত বড় বংশের ছেলে—কত নাম—কত লেখাপড়া করেছেন—শিক্ষায়, দীক্ষায়, অর্থে, আভিজাত্যে—

নীলাদ্রী বুঝতে পারে, এ তো কোন বোকা মেয়ের কথা নয়, রীতিমত বুদ্ধি রেখে প্রতিটি কথা বলছে—

নীলাদ্রি বলে, সেটাই কি আমার তোমাকে ভালবাসার পক্ষে অযোগ্যতা—

হ্যাঁ—কেউ আপনার ঐ অনুগ্রহকে সত্যি হলেও মিথ্যা বলেই ধরবে—ক্ষমার চোখে দেখবে না—

এত কথাই যখন তুমি আমার সম্পর্কে জান—নিশ্চয়ই এও জান, আমিই আমার অভিভাবক—

১৩

নীলাদ্রি বলতে থাকে—

আমার নিজের ইচ্ছের ওপরে কারো কথা বলবার যেমন কোন অধিকার নেই তেমনি বললেও শুনবো না আমি—শুনিওনি কখনও আজ পর্যন্ত।

তবু যা হয় না—

কি হয় না—

আপনি যা বলছেন।

হয় না! কেন?

আমি জানি, মা—মানে আপনার পিসিমা কখনোই রাজী হবেন না।

কিন্তু বিয়ে তো করব আমি—পিসিমা নন—তাছাড়া সব কিছু আমার উপরই না হয় তুমি ছেড়ে দিলে, শিউলী। তবে তোমার দিক থেকে সত্যি সত্যিই যদি কোন আপত্তি থাকে তো—

আমার দিক থেকে?

হ্যাঁ—বল শিউলী। নীলাদ্রি শিউলীর একটা হাত চেপে ধরে।

শিউলী কোন জবাব দেয় না।

কি, জবাব দিচ্ছ না যে, বল! জবাব দাও—

আমি—

বল—

আমি এখনো ভাবতেই পারছি না—

কি ভাবতে পরেছো না?

এমন কি আপনি আমার মধ্যে দেখেছেন যা—

ও—এই কথা—কি দেখেছি জান?

কি?

সহসা নীলাদ্রি শিউলীকে দু হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বলে, শিউলী, তুমি আমার স্বপ্ন—

কিন্তু—

উহুঁ। আর কোন কথা নয়। আমাদের শেষ কথা বলা হয়ে গিয়েছে—

শিউলী নীলাদ্রির বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে দেয়।

আর এক রাত্রে—

বাগানের মধ্যে অন্ধকারে নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে ছিল শিউলীর

ও আসতেই নীলাদ্রি ওকে বুকের মাঝে টেনে নেয়, এত দেরি করলে যে?

কি কবি, মা না ঘুমোলে তো আসতে পারি না—

মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পার না—

তুমি বুঝি ঘুমের মন্ত্র জান?

জানি—

বেশ, শিখিয়ে দিও আমায়। কিন্তু আমাব বড় ভয় করে—

ভয় কিসেব—

তোমার পিসিমা হয়ত—

চুপ করে থাক না কটা দিন—কলকাতায় ফিরে বিলেত যাবার আগে একদিন এসে তোমাকে বিয়ে করে যাবো—সঙ্গে করে একেবারে পুরোহিত নিয়ে আসবো।

সত্যি—বল, তিন সত্যি—

সত্যি সত্যি সত্যি—এবারে খুশী তো? নীলাদ্রি দুবাহুর নিবিড় বন্ধনে শিউলীকে টেনে নেয়।

শিউলী—

উঁ—

এবারে তোমার ভয় গেছে তো—

হুঁ—

হ্যাঁ—লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে শিউলী আমার—

হঠাৎ এক সময় শিউলী বলে, কাল এক জায়গায় যাবে?

কোথায়? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় শিউলীর মুখের দিকে নীলাদ্রি।

জান এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে জঙ্গলের মধ্যে এক পুরাতন বহু দিনের শিবমন্দির আছে—

তাই নাকি, তা সেখানে কেন ?

সেই মন্দিরের যে শিব ঠাকুর না—

কি ?

খুব জাগ্রত।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ—তাঁর কাছে যা চাওয়া যায় মনে মনে, তাই পাওয়া যায়। চল না, যাবে ?

বেশ, যাবো। কিন্তু তুমি বুঝি কিছু চাইবে ?

জানি না, যাও—

আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যাওয়া যাবেখন।

পরের দিন দুজনে বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে সেই মন্দিরে গিয়ে হাজির হলো।

শিউলী বলে, চল ভিতরে—

না—তুমি যাও—

তুমি যাবে না ?

না।

কেন ?

আমার যা চাইবার ছিল, তা তো পেয়েই গিয়েছি—আমার তো কিছু চাইবার নেই—তুমি যাও।

অগত্যা শিউলী একাই যায় মন্দিরের ভিতরে।

কিছুক্ষণ পরে যখন শিউলী মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে এলো, মৃদু হেসে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করে, চাইলে ?

হুঁ।

কি চাইলে তোমার জাগ্রত শিব ঠাকুরের কাছে ?

তোমার তিনি মঙ্গল করুন—

ব্যস্। আর কিছু না ! আর কিছুই চাইলে না ?

আর কি চাইব !

সত্যি আর কিছু চাওনি ?

না তো!

ফিরতে রাত হয়ে গেল।

দুজন দুই পথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। নীলাদ্রি যায় সদর আর খিড়কি দিয়ে যায় শিউলী।

বাড়িতে পেঁছে দেখে নীলাদ্রি—সৌদামিনী শিউলীর খোঁজ করছেন।

কোথাও তো যায় না মেয়েটা—গেল কোথায়!

সৌদামিনীর ঘরে ঢুকতেই তিনি বলেন, শিউলীকে দেখেছিস নীলু?

না তো।

আশ্চর্য! মেয়েটা গেল কোথায়, এত রাত হয়ে গেল—

কোথায় আর যাবে। হয়ত বাগানে বা ছাদে আছে—নীলাদ্রি বলে।

সৌদামিনী বলেন, তোর একটা চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।

চিঠি! কোথায়!

সৌদামিনী সেল্‌ফের উপর থেকে একটা খাম পেড়ে দেন নীলাদ্রির হাতে।

নীলাদ্রি আলোর সামনে চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করে।

কার চিঠি রে?

আমার সরকার যোগজীবনবাবুর।

কি লিখেছেন?

পাসপোর্ট-ভিসা রেডি হয়ে গিয়েছে—জাহাজেও প্যাসেজ বুক করা হয়ে গিয়েছে—

ও—তা কবে যাবি?

সামনের মাসেই—

সামনের মাসে কবে?

শেষাশেষি—কালই আমি যাবো, ভাবছি—

কালই যাবি!

হ্যাঁ—অনেক কিছু কাজ আছে—সব ব্যবস্থা করতে হবে—

শিউলী এসে ঐ সময় ঘরে ঢুকল—

আমকে ডাকছিলে, মা ?

কোথায় গিয়েছিলি ?

আমি তো দীঘির ধারে বসে ছিলাম—

তবে যে ওরা বলছিল, দীঘির ধারে খংজে তোকে পায়নি—

মাথাটা বড্ড ধরেছিল, তাই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসেছিলাম, মা

ঠিক আছে, যা—

নীলাদ্রি আগেই ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল—শিউলী সৌদামিনীর ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল। অন্ধকারে একটা থামের আড়াল থেকে নীলাদ্রি বের হয়ে আসে।

নীলাদ্রি ডাকল, শিউলী—

শিউলী এগিয়ে এলো নীলাদ্রির সামনে, জিজ্ঞাসা করল, তুমি কালই চলে যাচ্ছো ?

তুমি কার কাছে শনলে ?

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শনলাম, তুমি মাকে বলছিলে।

আজ রাত্রে একবার আমার ঘরে আসবে ?

রাত্রে !

হ্যাঁ—এসো লক্ষ্মীটি—কথা আছে—

কিন্তু—

এসো—আমি অপেক্ষা করবো—কথাটা বলে নীলাদ্রি আর দাঁড়াল না—চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

অনেক রাত তখন।

সবাই ঘমিয়ে পড়েছে।

নীলাদ্রি অপেক্ষা করে করে ঘমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা স্পর্শে ঘমটা ভেঙে যায়।

ঘরের মোমবাতির আলোয়—মৃদ একটা আলো-ছায়া ঘরে।

কে ?

আমি—

শিউলী ?

নীলাদ্রি উঠে বসে—

কেন আসতে বলেছিলে?

নীলাদ্রি দু হাতে শিউলীকে বুকের মাঝখানে টেনে নেয়। তারপর ফুঁ দিয়ে ঘরের মোমবাতির আলোটা নিভিয়ে দেয়।

শিউলী।

উঁ!

ভোর হয়ে এসেছে।

জানালা পথে ভোরের আবছা আলোর আভাস।

নীলাদ্রির বুকের উপরে শিউলী মাথা রেখে বসে আছে—

আজই তুমি যাচ্ছো? শিউলী শুধায়।

হ্যাঁ—

আবার কবে আসবে?

শীগগির, শিউলী—

উঁ—

তুমি কিন্তু আমি নিজে থেকে না সবাইকে বলা পর্যন্ত আমাদের কথা কাউকে বলবে না—

ছিঃ—আমি বলতে পারি নাকি।

জানি, তুমি বলবে না—তবু—বললাম কথাটা।

ঐ দিনই দুপুরের গাড়িতে চলে গেল নীলাদ্রি কলকাতায়।

পরের মাসেই নীলাদ্রির বিলেত রওনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার পরও আরো—মাস দুই।

তারপর?

তনিমা স্বপ্নাচ্ছন্ন মতই যেন জিজ্ঞাসা করে নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকিয়ে।

নীলাদ্রি বলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আমার বিলেত যাওয়া হয়নি কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসবার পর আবার সেই শহরের জীবন শুরু, হঠাৎ তখন—

তনিমা প্রশ্ন করে, শিউলীর সঙ্গে আর আপনার দেখা হয়নি?

না—

যাননি আর তাহলে সত্যিই সেখানে, বিলেত যাবার আগে?

না—সত্যি কথা বলতে কি—তার কথা আমার আর মনেও ছিল

না। না, একবার মনেও আসেনি—

একেবারে ভুলে গেলাম তাকে।

বলতে পারো তাই।

তনিমা কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে চুপ করে থাকে।

কখন যে ইতিমধ্যে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দুজনার একজনাও জানতে পারেনি।

তনিমা প্রশ্ন করে, তারপর?

তারপর?

১৪

নীলাদ্রি বলতে থাকে—কলকাতায় ফিরে এলাম—আবার সেই পূর্বের জীবন--নিত্য নতুন ফুলের সন্ধান করে বেড়াই আর ওদিকে ক্রমশঃ বিলেত যাবার দিন এগিয়ে আসতে থাকে।

শিউলীর কথা কি কখনো কোনও সময়ের জন্যই আপনার মনে হতো না?

না—

শিউলী—শিউলীর প্রয়োজন তখন আমার ফুরিয়ে গিয়েছে—শিউলী-পর্ব জীবনে আমার তখন শেষ হয়ে গিয়েছে—I wanted to enjoy her and I did it.

কেমন যেন বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নীলাদ্রির মুখের দিকে তনিমা।

নীলাদ্রি একটা সিগ্রেট ধরায়, আজ কোন কিছুই অস্বীকার করবো না। তার দেহ, তার যৌবনই সেদিন আমাকে আকর্ষণ করেছিল। তাই সেটুকু পুরোপুরি পাওয়ার পর তার প্রয়োজনও বোধহয় চিরদিনের মতই আমার কাছে শেষ হয়ে গিয়েছিল—তাই তখন তার নামটাও আর মনে ছিল না—তাছাড়া সেদিনকার নীলাদ্রির পক্ষে মনে রাখাও সম্ভবপর ছিল না শিউলীর মত একটা গেঁয়ো অশিক্ষিত মেয়েকে—তাছাড়া কি জানো?

নীলাদ্রি আবার একটি সিগ্রেট ধরায়।

সত্যিই তাকে আপনি ভুলে গেলেন?

আগেই তো বলেছি তোমাকে—যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, হাত বাড়িয়ে নিয়েছি—বিশেষ করে নারীর ব্যাপারে, তার জন্যে কোন sentiment বা সংস্কার বা কোন দ্বিধা দুর্বলতা কোন দিনই মনকে আমার কখনো পীড়া দেয়নি।

তাই আর কোন সংবাদই নিলেন না শিউলীর ?

না তখন নিইনি—তার কথা মনেও পড়েনি আমার, কিন্তু পরে মনে পড়েছিল।

মনে পড়েছিল ?

হ্যাঁ—

কাব ?

দীর্ঘ তিন বছব পবে বিলেত থেকে যখন ফিরে এলাম—তখন আশ্চর্য কি জান তনিমা—শিউলীব কথা আমাব কেন যেন হঠাৎ মনে পডল—পিসিমা তখন আর বেঁচে নেই, পিসিমাব সমস্ত সম্পত্তি আমিই পেযেছিলাম—একদিন গেলাম সেখানে। কে যেন আমাকে টেনে নিযে গেল সেখানে—

তাবপব ?

কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন প্রফুল্লবাবুর মুখে শুনলাম, সে এক রাত্রে সেই কুৎসিতদর্শন কেষ্টা চাকবটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে, আমি সেখান থেকে আসার মাস তিনেক পরে মনে মনে যেন স্বস্তি পেলাম একটা—সেই সঙ্গে এও মনে হলো, মেয়েটা এতটা নামল কি করে—আমার সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এত বড় রুচির বিকৃতি তাব হলো কি করে—so I washed off my hands, শিউলী-পর্ব চিবদিনের মত জীবনের আমার একটা closed chapter হয়ে গেল—

আচ্ছা, আপনি যদি সেদিন তার দেখা পেতেন আবার—

বলতে পাবি না—সেই দুর্বল মুহূর্তে আমি সেদিন তাকে বিয়েও হয়ত করতে পারতাম, কিংবা হয়ত মোটা টাকা সাহায্য দিয়ে তাকে—

টাকা দিতেন তাকে ?

বোধহয় তাই দিতাম—কিন্তু সে তো অতীত—সেদিনকার নীলাদ্রি চৌধুরী কয়েক দিন আগে পর্যন্ত—মানে শিউলীকে হঠাৎ

কোর্টে দেখবার আগে পর্যন্ত সেই নীলাদ্রি চৌধুরীই ছিল। কিন্তু চম্পাবাঈ যেন অকস্মাৎ নীলাদ্রি চৌধুরীকে প্রচণ্ড একটা আঘাত দিয়ে তার সব কিছু ওলোটপালোট করে দিয়েছে—

একটু থেমে একটু যেন দম নিয়ে নীলাদ্রি আবার বলতে থাকে, জান তনিমা, এই মুহূর্তে যে নীলাদ্রি চৌধুরী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে, he is altogether a different person—পর্যুদস্ত—ক্লান্ত—

তনিমা নিঃশব্দে নীলাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নীলাদ্রি চৌধুরী বলে, আজ মনে হচ্ছে, আমার এতদিনকার নীতি, আমার conviction সব মিথ্যা– একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার উপরে সব কিছু দাঁড়িয়ে ছিল এতকাল। দায়িত্বহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও পাশবিক লালসাটা তার মধ্যে আত্মতৃপ্তি ও শ্লাঘার উন্মাদনা যতই থাক না কেন, সেটা একটা বেলোয়ারী পাত্রের মতই ঠুনকো—একদিন সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবেই—সে সত্যকে সে অবশ্যম্ভাবীকে কেউ রোধ করতে পারে না, আজ পর্যন্ত পারেওনি—আমিও বোধহয় তাই পারলাম না। মুখ থুবড়ে হোঁচট খেয়ে তাই পড়লাম। বলতে বলতে নীলাদ্রি থামল—যেন একটু দম নিল।

তারপর আবার বলতে লাগল, আর তারই প্রায়শ্চিত্ত আমার চলেছে। কিন্তু এ-প্রায়শ্চিত্ত তো সম্পূর্ণ হবে না তনিমা, যতদিন যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি জানতে পারছি, ঐ চম্পাবাঈয়ের আজকের এই পরিণতির জন্য আমি কতটা দায়ী—

কিন্তু আপনি যা বললেন তার মধ্যে আপনার দায়িত্বের কথা আসছে কোথা থেকে—

কি বলছো তুমি! দায়িত্ব আমার নেই?

না। নেই—যে যেমন করেছে পরবর্তী কালে তারই ফলভোগ তাকে করতে হয়েছে—আর আজও করতে হবে—

না, না—সেদিন যদি সে প্রতারিত না হতো—

প্রতারিত! কে প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে? প্রতারিত যদি সে হয়েই থাকে তো নিজেকেই নিজে সে প্রতারণা করেছে—কোন দায়িত্বই নেই আপনার।

তুমি বুঝতে পারছো না তনিমা—

বুঝতে পারছি বৈকি—সে তো তার নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছিল—এবং যে পথে সে গিয়েছিল, এটাই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—ওর কথা আজ আপনি ভুলে যান।

না, না তনিমা, সব কিছুর মীমাংসা এত সহজে হতে পারে না—আমাকে জানতেই হবে যেমন করেই হোক তার এই কয় বছরের জীবনটা, আমি বুঝতে পারছি, আজ তার ঐ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। তাই তার সব কথা—

কি আর নতুন করে জানবেন, ঐ পথে একবার কোন মেয়ে পা ফেললে তার যা হয় তাই হয়েছে—মিথ্যে আপনি নিজেকে বিব্রত বোধ করছেন—ভুলে যান তার কথা।

না—তা সম্ভব নয়—অনেক চেষ্টা করেছি এ কয়দিন, কিন্তু পারিনি আর তা পারবোও না জানি—তাই বলছিলাম—তুমি আমাকে যদি একটু তাহায্য কর তনিমা—

আমি! আমি কি সাহায্য করবো আপনাকে?

দেখো, আমি এ দুদিন অনেক ভেবেছি। প্রথমতঃ আমার স্থির ধারণা—আমি যখন তাকে আদালতে দেখে চিনতে পেরেছি, সেও পেরেছে আমায় চিনতে। তাই আজ যদি আমি তার কাছে যাই সে হয়ত মুখই খুলবে না—তাছাড়া—

কি?

তার চোখের দৃষ্টিতে আমার প্রতি যে ঘৃণা দেখেছি—

ঘৃণা!

হ্যাঁ—যতবার তার সঙ্গে আমার আদালতে চোখাচোখি হয়েছে, মনে হয়েছে, তার দৃষ্টি থেকে যেন দুঃসহ ঘৃণা ঝরে পড়ছে—তাছাড়া যা বলেছিলাম—দ্বিতীয়তঃ আমি জানতে দিতে চাই না আপাততঃ কাউকে যে তার ব্যাপারে আমি interested. তাই বলছিলাম, তুমি যদি জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর—

আমি—আমি তার সঙ্গে দেখা করব—কি বলছেন আপনি!

শুধু দেখা করাই নয় তার কাছ থেকে যেমন করে হোক তার এই কয় বছরের সব কথা তোমাকে জেনে আসতে হবে—

না, না ক্ষমা করুন আমায়, এ আমি পারব না—

তনিমা—পারবে না—এটুকু তুমি আমার জন্যে করতে পারবে

না? দেখো, আমার স্থির বিশ্বাস ও মিথ্যে বলছে না। সত্যিই ও বদ্রীপ্রসাদকে হত্যা করেনি—ওকে আমাকে বাঁচতেই হবে—আর বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে ওর সব কথা আমার জানা দরকার—

না, না—এ আমি ভাবতেই পারছি না, মিঃ চৌধুরী।

তনিমা, আমি জানি, ঐ কাজ যদি কেউ পারে তো একমাত্র তুমিই পারবে—আমাকে—আমাকে তুমি সাহায্য কর তনিমা—একটা নির্দোষ মেয়েকে বাঁচতে দাও আর সেই সঙ্গে যদিও আমি জানি, আমি যা করেছি তার কোন প্রায়শ্চিত্তই নেই—তবু—তবু যদি এই নিদারুণ বিবেকের দংশন থেকে একটু নিষ্কৃতি পাই—

তনিমা নিঃশব্দে বসে থাকে।

কোন জবাবই দিতে পারে না।

এ যে কি যন্ত্রণা আমাকে সর্বক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছে, নীলাদ্রি আবার বলতে থাকে, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না—প্রতিদিন আদালতে যাই প্রতিদিন ওর মুখের দিকে তাকাই আর মনে হয় আমার, ওর ঐ নীরবতা—নীরবতা নয় দু চোখের দৃষ্টিতে যেন নীরব অভিযোগ আমার প্রতি—ও যেন বলছে, আমি শুনতে পাই—তুমি—তুমি—তুমিই আজ আমাকে এখানে টেনে এনেছো। তুমিই আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী।

তনিমা তবু নিঃশব্দ।

তনিমা, আমাকে—আমাকে তুমি বাঁচাও—নীলাদ্রি কথা বলতে বলতে সহসা তনিমার হাত দুটো চেপে ধরে আবেগভরে।

কিন্তু আমি—

শুধু আমার কথা নয় তনিমা—ঐ হতভাগিনী মেয়েটার কথাও ভাবো।

ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে চেষ্টা করবো—জেনানা ফাটকে দেখা করবার ব্যবস্থা করুন। তনিমা ধীরে ধীরে বলে।

নীলাদ্রির মত একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন মানুষের পক্ষে তনিমার জেলে গিয়ে চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি সংগ্রহ করে দিতে বেশী বেগ পেতে হলো না, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই অনুমতি এসে গেল।

কিন্তু নীলাদ্রির কথায় জেনানা ফাটকে গিয়ে চম্পাবাঈয়ের মত একটা নিম্নশ্রেণীর বিশেষ করে একজন হত্যাকারিণীর সঙ্গে দেখা করতে তার এতদিনকার রুচি-শিক্ষা-প্রবৃত্তি সব কিছুই যেন বাধা দিচ্ছিল।

তাছাড়া নীলাদ্রি যতই বলুক না কেন, চম্পা নির্দোষ—তার মত এক চরিত্রহীনা—অতি নিম্নস্তরের রূপোপজীবিনীকে কিছুতেই যেন মন থেকে ক্ষমা করতে পারছিল না, তনিমা।

ঐ ধরনের স্ত্রীলোকদের অসাধ্য কিছুই নেই—তাই—সে যতই বলুক যে বদ্রীপ্রসাদকে মদের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করেনি, তনিমা যেন মন থেকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা।

নারী যখন নীচে নেমে যায় তখন যে সে কত বড় নির্লজ্জ ও কত বড় নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা হতে পারে নীলাদ্রি হয়ত জানে না।

সামান্য একটা নর্তকী বাঈজী বারবনিতা চম্পা—যতই বলুক সে যে কেবল নৃত্য-গীতের দ্বারাই জীবিকা অর্জন করত, তনিমা বিশ্বাস করে না।

তাই বোধকরি জেনানা ফাটকে গিয়ে চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করবার কথাটা ভাবতেও তনিমার সমস্ত গা ঘিনঘিন করছিল প্রথমটায়।

কিন্তু নীলাদ্রির অনুরোধও সে ফেলতে পারল না।

একান্ত অনিচ্ছা ও অপ্রবৃত্তি নিয়েই সেদিন সে জেনানা ফাটকের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

লজ্জায় যেন তার মাথা কাটা যাচ্ছিল—চম্পাবাঈয়ের প্রতি একটা ঘৃণা ও আক্রোশে মনে মনে সে যেন ফুঁসছিল।

জেলার বললেন, বসুন মিস্ ব্যানার্জী, আমি সংবাদ পাঠাচ্ছি—

বলে জেলার সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন ভিতরে।

চম্পাবাঈয়ের কথাই এ কয়দিন সে বার বার শুনেছে কিন্তু এখনো তাকে তনিমা চোখে দেখেনি।

অনিচ্ছার একটা প্রতিক্রিয়া অনুক্ষণ মনের মধ্যে চললেও একটা কৌতূহলও পাশাপাশি বুঝি তার ছিল চম্পাবাঈকে সামনাসামনি দেখবার একটিবার।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জেনানা ফাটকের যে মেট-মেয়েটিকে চম্পাকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সে একাই যখন ফিরে এলো তনিমা বুঝি একটু বিস্মিতই হয়।

জেলার জিজ্ঞাসা করলেন, কই নিয়ে এলে না চম্পাবাঈকে ?

না হুজুর, সে এলো না। মেট বললে।

এলো না ?

বিস্মিত হয়ে জেলার প্রশ্নটা করেন।

না—বললে তার কেউ এ-দুনিয়ায় পরিচিত জন বা আপনার জন নেই—কারো সঙ্গে সে দেখা করবে না।

দেখা করবে না ?

না—

তনিমা যেন আরো একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেল।

জেলার জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে কি করবেন মিস্ ব্যানার্জী ?

কি আর করবো, দেখা যখন করবে না, ফিরে যাচ্ছি—

জেলখানা থেকে বের হয়ে এলো বটে তনিমা কিন্তু জেলখানায় যাবার সময় মনের মধ্যে তার যে প্রতিক্রিয়া কাজ করছিল এখন যেন সেটা অন্য এক বিপরীত খাদে বইতে শুরু করে তার অজ্ঞাতেই।

স্ত্রীলোকটির প্রতি যে তুচ্ছতা তাকে বিরূপ করে রেখেছিল এই কটা দিন, সেই তুচ্ছতাই ঐ মুহূর্তে তার মনের মধ্যে কোথাও যেন আর শিকড় খুঁজে পাচ্ছে না।

যতই কথাটা ভাবে তনিমা, ততই যেন তার আশ্চর্য লাগে। একটা সামান্য চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকের মত ও কথাগুলো শোনাল না।

তনিমা ফিরে এলো—

অধীর আগ্রহে নীলাদ্রি তনিমার প্রতীক্ষা করছিল।

তনিমা ঘরে ঢুকতেই সে প্রশ্ন করে, কি হলো, দেখা হলো? কিছু জানতে পারলে?

না—

জানতে পারলে না—বললে না বুঝি কিছু?

দেখাই তো করল না—

দেখাই করল না?

না।

কেন?

বললে, তার কেউ এ-দুনিয়ায় এমন কোন পরিচিত জন বা আপনার জন নেই—তার সঙ্গে দেখা করতে আসার, তাই কারো সঙ্গেই সে দেখা করবে না—

তাহলে?

আপনিই বলুন, এখন কি করবেন?

ঘরের মধ্যে নীলাদ্রি পায়চারি করছিল। একসময় ঘুরে দাঁড়াল।

বললে, You will have to try again. আবার যেতে হবে তোমায়—

কিন্তু সে তো দেখা করবে না—

করবে—করতেই হবে। যেমন করে যে ভাবে হোক তোমার তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে—তার এ কয় বছরের ইতিহাসটা আমায় জানতেই হবে—

কিন্তু—

বলেছি তো তোমায়, সে আমায় চিনতে পেরেছে, তাই হয়ত তুমি আমারই কেউ ভেবে দেখা করতে রাজী হয়নি—আবার তুমি যাও, আমার মনে হচ্ছে, সে দেখা করবে—

তনিমা উঠে দাঁড়াল। বললে, বেশ, যাবো—

তনিমা আবার গেল।

একদিন নয়, দুদিন নয়, পর পর চারদিন—কিন্তু চম্পাবাঈয়ের সেই একই জবাব, সে দেখা করবে না।

তনিমারও যেন অবশেষে কেমন একটা জিদ চেপে যায় বার

বারের ব্যর্থতায়, মনে মনে স্থির করে দেখা সে করবেই—

জেলারকে সে অনুরোধ জানায়, মিঃ চক্রবর্তী আপনি একবার চেষ্টা করুন—

প্রৌঢ় জেলার মিঃ চক্রবর্তী বলেন, দেখুন মিস ব্যানার্জী মেটের কাছে মেয়েটির সম্পর্কে যে পরিচয় পেয়েছি তাতে করে আমার মনে হয়, মিথ্যেই চেষ্টা করা হবে। তবু আপনি যখন বলছেন একবার চেষ্টা করবো আমি—কাল এই সময় আপনি আসবেন—

পরের দিন তনিমা আবার গেল—এবং তনিমাকে বসতে বলে জেলার মিঃ চক্রবর্তী জেনানা ফাটকে গিয়ে ঢুকলেন—

হত্যার অপরাধে বিচার চলছে ধর্মাধিকরণে—তাছাড়া মেয়েটি অসুস্থ। আলাদা একটা সেলে রাখা হয়েছিল চম্পাবাঈকে ডাক্তারের নির্দেশে।

একটা টুলের উপরে চুপচাপ বসেছিল চম্পাবাঈ। চক্রবর্তী এসে সামনে দাঁড়ালেন।

চম্পাবাঈ—

বিষণ্ণ ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে তাকাল চম্পাবাঈ।

জীবনে অনেক কয়েদী দেখেছেন মিঃ চক্রবর্তী। কিন্তু কেন যেন চম্পাবাঈকে দেখা অবধি তাঁর মনে হয়েছে, যে গুরু অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে ঐ মেয়েটি আজ তার শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তার সবটা দায়িত্বই হয়ত ওর নয়। এমনও হতে পারে, হয়ত ঘটনাচক্রে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ঐ হতভাগিনী মেয়েটি না জেনেই জড়িয়ে পড়েছে।

চম্পাবাঈ—ডাকলেন মিঃ চক্রবর্তী আবার।

আপনি তো এখানকার জেলার—কর্তা—

হ্যাঁ—

বলতে পারেন—ওরা কেন আমাকে এখনো আদালতে রোজ রোজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—

বিচার না শেষ হওয়া পর্যন্ত যেতে তো হবেই—

কিসের বিচার—আমি তো বলেছিই, আমি হত্যা করেছি তাকে —তবে—

কি তবে?

তবে কেন ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছে না ?

চম্পা—

আপনি একটু দয়া করে বলে দেবেন ওদের, আদালতে আর আমি যেতে চাই না—

বলবো—তোমাকে একটা কথা বলছিলাম—

কি ?

একজন ভদ্রমহিলা দিনের পর দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, দেখা একটিবার করো না তার সঙ্গে—

না।

একটিবার দেখা করলে ক্ষতি কি ?

আমার কেউ নেই যে আমার সঙ্গে এই জেলে দেখা করতে আসতে পারে—

নাই বা তেমন আপনার জন কেউ থাকল। তাহলে উনি যখন একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন—কে বলতে পারে, হয়ত ওঁর দ্বারা তোমার কোন উপকারও হতে পারে—তোমার ভালই হতে পারে—

আমার উপকার-ভাল—কথাটা বলে মৃদু হাসল চম্পাবাঈ। যেমন বিষণ্ণ, তেমনি করুণ সে হাসি।

চল—একবার দেখা করবে চল—

না—

হয়ত তুমি জাননা। উনি হয়ত তোমার কোন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াও হতে পারেন—

আমি জানি—দূর বা নিকট কোন আত্মীয়ই এ-জগতে আমার নেই—তারপরই হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে চম্পা বলে, বেশ—চলুন—আপনি যখন বলছেন সাহেব, দেখা আমি করবো—

১৬

দেখা হলো দুজনার জেলের মধ্যেই।

কি চান আপনি ? রীতিমত রুক্ষ মেজাজেই সম্ভাষণ করে চম্পাবাঈ তনিমাকে।

তনিমা ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কেন এভাবে বার বার এসে জেলের মধ্যে আমাকে বিরক্ত করছেন —আবার বলে চম্পা।

ইতিপূর্বে চম্পাবাঈকে তনিমা দেখেনি। এই প্রথম দেখল।

রুগ্ন-কৃশ, মাথার চুল রুক্ষ, বিষণ্ণ ক্লান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি।

মেয়েটিকে এককালে যে দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিল, তনিমার সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু আজ তার সর্ব অবয়বে যেন একটা দীর্ঘ দিনের অত্যাচারের চিহ্ন স্পষ্ট।

বোস—তনিমা বলে।

না—কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাই বলুন।

কেন যেন তনিমার মনটার মধ্যে একটা অনুকম্পা জেগে ওঠে ঐ মুহূর্তে—সে মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি তোমার শত্রু নই, চম্পা।

শত্রু বা মিত্র কেউই আমার নেই—কেন দেখা করতে চান, তাই বলুন।

তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল চম্পাবাঈ—

আমার সঙ্গে—

হ্যাঁ—

আমার সঙ্গে আবার আপনার কি কথা থাকতে পারে, আপনাকে চিনি না আমি—জীবনে কখনো আপনাকে দেখিওনি—

চেনো না আমাকে তুমি ঠিকই—দেখোওনি কখনো, তাহলেও তোমার সঙ্গে কি আমি দুটো কথা বলতে পারি না? মৃদু হেসে তনিমা বলে।

দেখে বেশভূষায় চেহারায় আপনাকে তো কোন বিশিষ্ট ভদ্রঘরের একজন মহিলা বলেই মনে হচ্ছে—আমার মত একজন নিকৃষ্ট-শ্রেণীর স্ত্রীলোক—যার আদালতে খুনের দায়ে বিচার চলেছে, তার সঙ্গে আপনার কি এমন কথা থাকতে পারে, বলুন তো?

আমি তোমার সব কথা জানতে চাই, শুনতে চাই—

আমার সব কথা! হঠাৎ যেন কথাটা বলতে গিয়ে থমকে যায় চম্পা।

হ্যাঁ—তোমার সব কথা।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে চম্পাবাঈ।

তনিমা চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

হাসি থামিয়ে এক সময় আবার বলে চম্পা, কিন্তু কি জানতে চান আপনি আমার সম্পর্কে বলুন তো?

তুমি কে, কি তোমার পরিচয় সত্যিকারের?

আমি কে!

হ্যাঁ।

তা জেনে, আপনার কি হবে?

আমার প্রয়োজন বলেই জানতে চাইছি—

কি প্রয়োজন বলুন তো?

থাকতে পারে কে ন প্রয়োজন।

বুঝেছি এবার—আপনি বুঝি গল্প-টল্প লেখেন?

গল্প!

হ্যাঁ—আমার গল্পটা বুঝি লিখতে চান।

ধর, যদি তাই হয়—

তাহলে জেনে রাখুন—একজন নর্তকী বাঈজী, যাদের আপনারা বেশ্যা বলেন, ঠিক তেমনিই একজন আমি—নতুন কিছু নেই আমার মধ্যে—

আছে বৈকি, শান্ত গলায় তনিমা বলে, বেশীর ভাগই তো এ-পথে মেয়েরা বাধ্য হয়ে আসে—ঘটনাচক্রে বা পাপচক্রে বাধ্য হয়ে—

কি করে বুঝলেন—আপনি তো একজন ভদ্রঘরের মেয়ে—

না—তাহলেও ভুলে যাচ্ছো কেন, আমিও তো তোমারই মত একজন মেয়েমানুষ—আমাদেরও বুকে যেমন দয়া মায়া স্নেহ ভালবাসা আছে, তেমনি তোমারও আছে—

না, না—ওসব আমার কিছু নেই—একটা বাঈজী—বেশ্যা—

আমি জানি, আজ তুমি যাই হও না কেন, নিশ্চয়ই একদিন তা তুমি ছিলে না।

হঠাৎ চম্পাবাঈ আবার খিলখিল করে হেসে বলে, এখন বুঝতে পারছি, আমার সন্দেহটা মিথ্যা নয়, সত্যিই আপনি বই-টই লেখেন—

বই পড়ো তুমি—

না—

কেন ?

যত সব মিথ্যে কথা—কল্পনা—অবাস্তব—

কে বললে তোমাকে, বইতে যা লেখা হয়, সবই অসম্ভব—মিথ্যা—

জানি আমি—সত্যি কি বোকা ছিলাম আমি একদিন। রামায়ণ মহাভারতের সব কথা ভাবতাম সত্যি বলে—হঠাৎ একটু থেমে কতকটা আত্মগতভাবেই যেন বলে আবার চম্পা।

সত্যি হলে বুঝি এমনটা হয়—না—সব মিথ্যা—বানানো গল্প—

আচ্ছা চম্পা, তোমার কে আছে ?

কেউ নেই—

মা-বাপ-ভাই-বোন-স্বামী-সন্তান —

না, না—কেউ নেই, কেউ নেই—সন্তান—না, না—ছিঃ বাঈ-জীর আবার সন্তান—না, না—আপনি যান—হঠাৎ যেন বিচলিত হয়ে ওঠে চম্পাবাঈ।

আর একটি কথাও বলল না সেদিন চম্পা।

তনিমা ফিরে এলো বিচিত্র একটা মনের অবস্থা নিয়ে। জিদটা মনের মধ্যে তার তখন আরো দৃঢ় হয়েছে। চম্পার সব কথা তাকে জানতেই হবে, যেমন করেই হোক—একটা কৌতূহলও তাকে পীড়ন করে ঐ সঙ্গে।

আবার এক দিন পরে জেলে গেল তনিমা।

সেদিন চম্পাকে ডাকতেই সে এল, আবার এসেছেন কেন ?

দেখ চম্পা, আমি বিশ্বাস করি, তুমি কাউকে হত্যা করোনি—

কি করে বুঝলেন, করিনি ?

বুঝতে পেরেছি—

ছাই বুঝেছেন—কিছু আপনি বোঝেন না।

সে তুমি যতই বল—আমি বিশ্বাস করি না, তুমি কাউকে হত্যা করতে পারো।

চম্পা যেন হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়—একটুক্ষণ চুপ করে

থাকে, তারপর হেসে ফেলে।

হাসছো যে?

হাসছি, আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি এসে যায়—যাঁরা আমার বিচার করতে বসেছেন, তাঁরা স্থিরনিশ্চিত যে আমি হত্যা করেছি, আর সত্যিই তো—পরে আমিও ভেবে দেখেছি, হয়ত আমিই হত্যা করেছি বদ্রীপ্রসাদবাবুকে, নচেৎ সে আমার দেওয়া পাউডার মদের সঙ্গে পান করে মারা গেল কি করে—কত বুদ্ধি কত জ্ঞান জজবাবুদের—তারা কি এতবড় ভুল করতে পারেন—

পারেন, আর ভুলও হয়—তুমি আমাকে তোমার সব কথা বলো চম্পা—আমি—আমি চেষ্টা করবো—

কি চেষ্টা করবেন?

কেন, তোমাকে বাঁচাতে।

বাঁচতে তো আমি চাই না—

সেকি! বাঁচতে চাও না তুমি?

না।

ও তোমার অভিমানের কথা—

ওমা—সে কি কথা, অভিমান আবার আমি কার উপরে করতে যাবো—কে আছে আমার—আর কেনই বা করতে যাবো অভিমান—

হয়ত তুমি জান না—সত্যিই তোমার আপন জন কেউ আছে। তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেউ আছে।

আছে?

হ্যাঁ আছে—আমি জানি, যে সর্বক্ষণ তোমারই কথা ভাবছে আজ—এমন একজন আছে, জেনো, হঠাৎ বলে ফেলে কথাটা তনিমা।

খিলখিল করে আবার হেসে ওঠে চম্পা।

বলে, এবারই ভাল বলেছেন, আমার জন্য একজন সর্বক্ষণ ভাবছে। জানেন, আমার কাছে লোক এসেছে স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে নয়—টাকার তোড়া নিয়ে আমার গান, নাচ আর আমার দেহটা ভোগ করবার জন্যে—এক রাত্রি দু রাত্রির অতিথিরা সব—

তনিমা চেয়ে থাকে চম্পার মুখের দিকে।

মনে হয় যেন বুকজোড়া একটা বিতৃষ্ণায় মেয়েটা ছটফট করেছে

রাত্রিদিন।

চম্পা আবার বলে, অবিশ্যি সেজন্য আমারও কোন দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না কোন দিন। আর থাকবেই বা কেন—আপনিই বলুন না, বাঈজী নর্তকী আমি, আমার কাছে মানুষ-জন আসবে ভালবাসতে তো নয়—আমার নাচ-গান উপভোগ করতে—আমার দেহটা ভোগ করতে। তারা আমায় টাকা দিয়েছে, আমিও তাদের সব দিয়েছি—

কিন্তু সবাই কি তাই—

সব—সব—সবাই—একটু থেমে বলতে থাকে, জানেন না হয়ত আপনি ঐ পুরুষগুলোকে—ওদের কাছে মেয়েমানুষের একটা মাত্র প্রয়োজনই আছে—মেয়েমানুষের এই দেহটা, আর আশ্চর্য কি জানেন? সেটা হাতের মুঠোব মধ্যে পেলেই তাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়।

শেষের কথাগুলো বলাব সময় চম্পার চোখের দৃষ্টি যেন কেমন সক্রোধে ও ঘৃণায় রক্তিম হয়ে ওঠে।

চম্পা—

অথচ মেয়েগুলো কি বোকা—পুরুষদের ঐ সব কথাগুলো কেমন বিশ্বাস করে নেয়—

চম্পা, আবার ডাকে তনিমা।

বিশ্বাস করে সব তাদের হাতে তুলে দেয়—

কি বোকা—

-কিছুক্ষণ পর তনিমা আবার প্রশ্ন করে—

আচ্ছা চম্পা, ঐ চম্পা ছাড়া তোমার আর কোন নাম নেই? অনেকের তো অনেক সময় দুটো তিনটেও নাম থাকে—

না, আমার আর কোন নাম নেই। কিন্তু ওসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন তো—কি হবে আপনার জেনে, যদি থাকেই আমার অন্য কোন নাম?

আমি তো তোমাকে প্রথম দিনই বলেছি, আমি তোমার সব কথা জানতে চাই চম্পা—সব কথা—কোথায় তুমি ছিলে—কে তোমার মা বাবা—কোথায় দেশ তোমার—কে তোমার আছে বা ছিল—কি করে তুমি এ-পথে এলে—কেন এলে—

হঠাৎ যেন থমকে গিয়েছে চম্পা।

তারপর বলে, সত্যি কথা বলুন তো, কে আপনি! কেন আসেন রোজ রোজ আমার কাছে—সত্যি সত্যিই কি আপনি চান?

১৭

মনে করো না কেন, আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী?

আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবেন?

কি বল?

সত্যি বলুন, আপনাকে কি কেউ আমার কাছে পাঠিয়েছে?

চমকে ওঠে তনিমা, কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বলে, না, না—কে আবার আমাকে পাঠাবে—আমি নিজেই এসেছি—

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ—কাগজে তোমার কথা পড়ে কেমন কৌতূহল হলো—

কাগজে বুঝি বের হয়েছে আমার সব কথা—

হ্যাঁ—

কি লিখেছে? আমি একটা বেশ্যা—আমি একজনকে খুন করেছি—

আমি জানি, তা সত্যি নয়—

সত্যি যদি নাই হয়—তাতে কার কি এসে গেল।

কেন তুমি মিথ্যা অপবাদকে মাথা পেতে নেবে? কেন?

উপায়ই বা কি? কেউ তো বিশ্বাস করেনি—জানি করবেও না।

করবে—করবে চম্পা। করতে নিশ্চয়ই হবে সবাইকে।

চম্পা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, জানি না—জেনে আপনার কি লাভ হবে? তাছাড়া আমিই বা বলতে যাব কেন আপনাকে—কে আপনি, কি আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

রক্তের সম্পর্কটাই কি একমাত্র সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের, চম্পা—তা তো নয়—তাহলে তো মানুষের ঘরের মধ্যে দম আটকে মরতে হতো—সংকীর্ণতায় আত্মঘাতী হতে হতো—এমন করে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির বন্ধন একটা

গড়ে উঠতো না। এই আমার কথাই ধর না—তোমার প্রতি একটা টান মমতা না থাকলে কি তোমার কাছে এমনি করে ছুটে ছুটে আসতাম জেলের মধ্যে দেখা করবার জন্য, বার বার তুমি ফিরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও—

জানি না—আপনাব কথা বুঝি না—

তোমার সব কথা আমাকে জানতে দাও—

চম্পা চুপ করে থাকে।

আমি মেয়েলোকের মন দিয়ে বুঝতে পারি, তনিমা বলে, নিশ্চয়ই কোথাও কারো কাছে তুমি একদিন নিদারুণ আঘাত পেয়েছো—আব সে-আঘাতেই তোমাকে হয়ত একদিন এই পথে ঠেলে দিয়েছিল—অসহায় নিবুপায় তুমি যুদ্ধ করতে কবতে ক্লান্ত হয়ে চরম হতাশায় হয়ত একদিন—

সে আপনি বুঝবেন না, হঠাৎ বলে ওঠে চম্পা, একটা অসহায় মেয়ে যাব সমস্ত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-প্রতীক্ষা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, যার এমন কেউ নেই পাশে, তাকে যে একটা সান্ত্বনার কথা বলে—

জানি আমি—তাহলে হয়ত সেদিন তোমাকে হতাশায় ভেঙে পড়তে হতো না—

জানেন না, কিছুই আপনি জানেন না—কল্পনাও করতে পারবেন না—

স্মৃতিব পট থেকে যেন এতদিনকার কালো পর্দাটা ধীরে ধীরে অপসাবিত হয়।

চম্পাবাঈয়েব দুচোখের কোল বেয়ে জল ঝরতে থাকে।

তার গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে অশ্রু ঝরতে থাকে।

জানেন, আমিও একদিন আপনার মতই সব বিশ্বাস করতাম। এই পৃথিবীটা মনে হতো কত সুন্দর—কিন্তু সব স্বপ্ন আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেল—

তনিমা চুপ করে থাকে।

সত্যি—কি বোকাই ছিলাম আমি। কি বোকা—

যেন স্বপ্নের ঘোরে অতঃপর বলতে থাকে চম্পা—

সে এলো—প্রথম তাকে দেখলাম। মা বলায় চায়ের কাপ হাতে যখন গিয়ে ঘবে ঢুকে বললাম, আপনার চা—জানালার কাছে

দাঁড়িয়ে ছিল সে পিছন ফিরে, ঘরে আমার দিকে—সে এগিয়ে এলো—আমার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে গিয়ে তার স্পর্শ প্রথম পেলাম।

১৮

নীলাদ্রি তার আইনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, চম্পার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি এমন কঠিন যে মামলায় তাব নিষ্কৃতি কিছুতেই মিলবে না।

কনভিকশন তাব হবেই।

অথচ চম্পা বদ্রীপ্রসাদকে হত্যা করেছে, এ-কথাটাও যেন তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কিন্তু বিশ্বাস না হলেই বা কি? প্রমাণ কোথায় যে সে হত্যা করেনি—

প্রমাণ ছাড়া তো চম্পাকে বাঁচানো যাবে না।

সর্বাপেক্ষা বড় ও মোক্ষম প্রমাণ তার বিরুদ্ধে, তার জবানবন্দিতে সে বলেছে—নিজের হাতে সে কি একটা পাউডার বদ্রীপ্রসাদের মদের গ্লাসে মিশিয়ে দিয়েছিল তাকে ঘুম পাড়াবার জন্য, যার ফলে তার নিদ্রাই নয় কেবল, চিরনিদ্রা হয়েছে।

এবং সেই পাউডারটার মধ্যে বিষ ছিল না, চম্পা বললেও সে-রাত্রে বদ্রীপ্রসাদের ব্যবহৃত মদের পাত্র ও মৃতের পাকস্থলীর খাদ্যবস্তু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে অ্যাট্রোপিন বিষ পাওয়া গিয়েছে।

কোথা থেকে এলো—ঐ বিষ?

কেমন করে এলো?

চম্পা জেনে শুনে বিষ দেয়নি সুনিশ্চিত। অথচ যে পাউডারটা সে-রাত্রে সে বদ্রীপ্রসাদকে ঘুম পাড়াবার জন্য তার মদের পাত্রে মিশিয়ে দিয়েছিল—তার মধ্যেই হয়ত বিষ ছিল, যে কথাটা সে জানত না বা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি।

মদের পাত্রের তলানীতে ও মৃতের পাকস্থলীতে যখন বিষ পাওয়া গিয়েছে কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে তখন সুনিশ্চিত, বদ্রীপ্রসাদকে

সে-রাত্রে বিষ দেওয়া হয়েছিল।

তবে চম্পা দেয়নি সে বিষ, তাও ঠিক—এবং সত্যিই যদি সে না দিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ মদের পাত্রে অ্যাট্রোপিন বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল সে রাত্রে—এবং চম্পা যদি না জেনে দিয়ে থাকে তো কে দিতে পারে সে-বিষ।

মাত্র দুই গ্রেন অ্যাট্রোপিনই নাকি একজনের পক্ষে লিথ্যাল ডোজ—অনায়াসেই একজনের মৃত্যু ঘটাতে পারে—ডাক্তার বলছিল।

কে দিতে পারে—কে আনতে পারে ঐ বিষ? কোথা থেকে আসতে পারে—

ভাবতে ভাবতে নীলাদ্রির এক সময় মনে হয়, চম্পা না দিয়ে থাকলে সে রাত্রে আর কে—বা কার পক্ষে সম্ভব ছিল বিষ দেওয়া বদ্রীপ্রসাদকে—

চম্পার দাসী—রাসমণি—চম্পার ভৃত্য হারাধন, ঝি রাসমণি হয়ত নয়—

তবে কি হারাধন?

হারাধন—

মনে পড়ে নীলাদ্রির, চম্পার ভৃত্য হারাধনই এনেছিল ঘুমের পাউডার সেই রাত্রে ডিসপেনসারিতে গিয়ে অবিশ্যি চম্পারই নির্দেশে।

ঠিক হারাধন সম্পর্কে খোঁজ-খবর একটা নেওয়া প্রয়োজন।

বিচারে নিম্ন আদালত থেকে খালাস পাবার পর হারাধন বেল-গাছিয়ায় একটা বস্তিতে ঘর ভাড়া করে আছে, খবর নিয়ে জেনেছিল নীলাদ্রি।

কথাটা যত চিন্তা করে, ততই যেন নীলাদ্রির হারাধনের উপরে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে।

হারাধনকে একবার ভাল করে যাচাই করে দেখা দরকার।

দু-এক দিনের পরে হারাধন সম্পর্কে একটা মতলব নীলাদ্রির মাথার মধ্যে আসে।

এমনিতে হারাধনের সঙ্গে সে গিয়ে দেখা করতে চাইলে বা ডেকে পাঠালে হারাধন হয়ত দেখাও করবে না, আসবেও না।

তার মনে হয়ত সন্দেহ দেখা দেবে, সত্যিই যদি সে দোষী হয়।

অথচ এ-ব্যাপারে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করা যায় না।

যেতে হলে নিজেরই যেতে হয়।

কিন্তু নীলাদ্রি হয়ে নয়—

অন্য কোন পরিচয় এবং যে পরিচয়টা হঠাৎ হারাধন সন্দেহ করতে পারবে না।

কয়েকদিনে হারাধনের সব সংবাদ আরো ভালো করে সংগ্রহ করলো নীলাদ্রি।

হারাধন বর্তমানে আর চাকরি করে না—অথচ দেশেও ফিরে যায়নি। থাকে বর্তমানে বেলগাছিয়ায় একটা ঘর নিয়ে আলাদা ভাবে —এবং ভাল ভাবেই থাকে।

মেক-আপ সম্পর্কে নীলাদ্রির কিছুটা জ্ঞান ছিল।

সেদিন সন্ধ্যারাত্রে নিঃশব্দে পশ্চাতের দ্বারপথ দিয়ে নীলাদ্রির বাড়ি থেকে কে একজন বেরুল।

বাড়ির পশ্চাৎদিকে সরু একটি গলিপথ।

গলিপথে একটি মাত্র আলো—তাই আলোর পর্যাপ্তি না থাকায় একটা আলো-ছায়ার রহস্য যেন।

নীলাদ্রির গৃহের পশ্চাতের দ্বারপথ দিরে বের হয়ে লোকটা এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে গলির মধ্যে লাইট-পোস্টটাব নীচে এসে দাঁড়াল।

লোকটার বেশ ও চেহারা ভৃত্যশ্রেণীর।

মুখে পুরুষ্টু গোঁফ—সামান্য খোঁচা খোঁচা দাড়ি—মাঝখানে সিঁথি—তেল-চকচক করছে।

ডান গালে একটা বড় আঁচিল।

চওড়া কালো বাবুপাড় ধুতি পরনে ও গায়ে হাফহাতা ঈষৎ ময়লা ডোরাকাটা একটা শার্ট।

পায়ে পুরাতন একজোড়া স্যাণ্ডেল।

পকেট থেকে একটা বিড়ির বাক্স বের করে তা থেকে একটা বিড়ি বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল লোকটা।

তারপর বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

পথে তখনও যথেষ্ট যানবাহন ও পথচারীর ভীড়। ট্রাম চলছে।

রাস্তায় পেঁছে লোকটা একটা উত্তরমুখী ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে বসল।

ঢং ঢং করে ট্রাম চলছে।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ লোকটা হারাধনের বেলগাছিয়ার বস্তির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে।

ইলেকট্রিক আলো।

১৯

হারুবাবু আছেন—হারুবাবু—লোকটা ডাকে।

কে?

দয়া করে একবার বাইরে আসবেন?

হারাধন বের হয়ে এলো, কে?

আপনিই তো হারুবাবু—

'হারুবাবু'—জীবনে এই প্রথম হারাধন ঐ সম্ভাষণ শুনছে। ঐ বাবু ডাকটার মধ্যে যে এমন একটা পুলকানুভূতি আছে, হারাধন কি আগে জানত—না কখনো এর আগে অনুভব করেছে!

হ্যাঁ—হারাধন জবাব দেয়, আপনি?

আমায় আপনি চিনতে পারবেন না—আমার নাম পেহ্লাদ—মানে পেহ্লাদ প্রামাণিক।

কোথা থেকে আসছেন—আমার কাছে আপনার দরকারটা কি বলুন তো!

দরকার একটু ছিল, প্রহ্লাদ বলে, কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে সে-সব কথা—

ওঃ আচ্ছা আসুন ভেতরে—

প্রহ্লাদ হারাধনের আহ্বানে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

বস্তির ঘর হলে কি হবে, বেশ ছিমছাম—সুন্দর একটি শয্যা সুজনী দিয়ে ঢাকা—গোটা চারেক ছোট-বড় দামী দামী সুটকেস এক কোণে—অন্য ধারে একটি টেবিল—টেবিলের উপর ছোট একটি রেডিও সেট, একটি টেবিল ক্লক—একটা কাচের জাগ ও কাচের গ্লাস—

একটা আলনায় কিছু নতুন
খান দুই নতুন চেয়ারও ঘরে
বসুন—হারাধন বলল।
চেয়ারের উপর বসে পকে
রুমাল বের করে প্রহ্লাদ—ভরভ
হয়।
মুখটা মোছে আস্তে আস্তে
হারাধনবাবু, আমি কিন্তু
দ্বারস্থ হয়েছি—
বিশেষ প্রার্থনা—
হ্যাঁ—প্রার্থনাই—বলতে বলতে পকেট থেকে বিড়ির বাক্সটা প্রহ্লাদ বের করে—
কিন্তু তার আগেই হারাধন একটা সিগ্রেটের প্যাকেট পকেট থেকে বের করে প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়—নিন—
প্রহ্লাদ কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে, হেঃ হেঃ তা দিন আপনারটাই নিই—
একটা সিগ্রেট নিল প্রহ্লাদ।
সিগ্রেটে বেশ আরাম করে গোটা দুই টান দিয়ে প্রহ্লাদ বলে, হারুবাবু, প্রার্থনার কথা বলছিলাম না—আমার একটি ভগ্নী আছে—
ভগ্নী—
হ্যাঁ, অর্থাভাবে আজো তার বিয়ে দিতে পারিনি—অথচ ভগ্নীটি আমার দেখতে ভালই—রান্নাবান্না কাজকর্মে একেবারে চৌখস।
তা আপনি আমার কাছে কি চান প্রহ্লাদবাবু?
যোগীনকে চেনেন তো?
কোন্ যোগীন?
আপনাদের গাঁয়েই বাড়ি—তার কাছেই তো শুনলাম আপনার কথাটা। আপনার প্রথমা স্ত্রীটির নাকি অনেকদিন হলো মৃত্যু হয়েছে—
হ্যাঁ—
আপনি আবার বিবাহ করবেন, বিবেচনা করছেন—

রাস্তায় পেঁছে লোকটা এক'

বসল। ।। কেন--আপনার বয়সটিই বা কি—এখনো

ঢং ঢং করে ট্রাম।নুষটি দেখতে—

রাত সাড়ে।যে বলেন— ।

বস্তির ঘরের কথা বলবো বৈকি! যদি বলি, প্রথম পক্ষ, তা তো

ইন্সেলতে পারবে না আপনার।

ি যে বলেন—

না হারুবাবু, অনেকখানি আশা নিয়ে এয়েছি—না, করতে পারবেন না—ভগ্নীটিকে চরণে আপনার স্থান দিতেই হবে—

না, না—এ-বয়সে আবার বিয়ে—

আবার মানে, এখনো দুবার বিয়ে আপনি করতে পারেন। তা-ছাড়া ভগ্নীটি আমার অপছন্দেবও নয় কিছু—এই দেখুন না ছবি—বলতে বলতে পকেট থেকে একটি লাস্যময়ী তরুণীব ফটো বের করে সামনে ধবে, দেখুন না—দেখুন—

ফটোটার দিকে তাকিয়ে হারাধনেব চোখেব তাবা দুটো চকচক করে ওঠে!

বুঝলেন হারুবাবু, আপনাকে কষ্ট কবে যেতেও হবে না—আমিই নিয়ে আসবো এখানে—এখন বলুন, ফটো দেখে পছন্দ হয় কি না—

তা মন্দ কি—ভালই তো দেখতে পেল্লাদবাবু আপনার ভগ্নীটি, তা বয়স কত—

এই ধরুন ষোল-সতের—মিথ্যে বলব না—

আপনি সত্যিই আমায় বড় বিপদে ফেললেন, দেখছি—

বিপদ—সে আবার কি!

নিশ্চয়ই, এ-বয়সে আবার বিয়ে—

রাখুন তো মশাই, পুরুষেব আবার বয়স কি—বলেছে পুরুষ পরেশ-কিন্তু-

না, বললে আমি ছাড়বই না—এ-সুযোগ যখন ভগবান আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন—বলুন, আমায় নিরাশ করবেন না—

ফটোটা রেখে যান, ভেবে দেখি—

বেশ, তবে কবে আসব, বলেন?

দিন দুই বাদে আসবেন।

এইখানেই তো ?

হ্যাঁ—তাই আসবেন।

প্রহ্লাদ উঠে দাঁড়ায়, তবে আজ আজ্ঞা হোক হারুবাবু, চলি—

আহা যাবেনখন—বসুন, মিষ্টি মুখ করুন।

না, না—মিষ্টিমুখ আবার কি—

তা কি হয় —ধরুন আত্মীয়তা যদি হয়ই—

হবে হবে—বেশ—আনুন মিষ্টি—

আপনি একটু বসুন—চট্ করে আমি ঘুরে আসি—

হারাধন বের হয়ে গেল।

প্রহ্লাদ একটু অপেক্ষা করে। তারপর দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে সুটকেসগুলো একটা একটা করে খুলে ফেলে হারাধনের চাবি দিয়ে—চাবিটা সে হারাধনের বালিশের নীচেই পেয়েছিল—

তৃতীয় সুটকেসে কি যেন একটা পায় প্রহ্লাদ—চট্ করে সেটা তুলে পকেটে ভরে ফেলে। তারপর আবার সুটকেসগুলো বন্ধ করে বসে থাকে হারাধনের অপেক্ষায়—

একটু পরে হারাধন মিষ্টি নিয়ে এলো—মিষ্টি খেয়ে বিদায় নিল প্রহ্লাদ।

২০

কেবল হারাধনই নয়—আরো দুজনের খোঁজ-খবরের প্রয়োজন আছে —নীলাদ্রি ভাবে।

রাসমণি ও দরোয়ান কিষেণলাল।

চম্পার দাসী ও দরোয়ান।

তাদের কাছে গেলে হয়ত আরও কিছু জানা যাবে।

দিন দুই পরে এক সন্ধ্যারাত্রে—

আবার দেখা গেল নীলাদ্রি চৌধুরীর বাড়ির পশ্চাৎদিকের সেই দ্বারপথ দিয়ে গলিপথে একজন বের হয়ে এলো।

সম্পূর্ণ অন্য বেশ—

বিহারী বেশভূষা। পাকানো সরু গোঁফ—মোম দেওয়া। মাথায়

টুপি, হাতে একটা ব্যাগ—

ট্রামে করে আজ লোকটা ধর্মতলায় এসে নামল, তারপর হেঁটে এক ম্যানসনের সামনে এসে দাঁড়াল।

নীচের একটা ঘরে কয়েকজন দরোয়ানশ্রেণীর লোক আড্ডা দিচ্ছিল—একজন রোটি পাকাচ্ছিল—

একজন প্রৌঢ় মত দরোয়ানকে শুধায় সে. কিষেণলালাজী হ্যায়—

হ্যাঁ—লেকেন কৌন হো তুম?

মুঝে তো আপ পরছানগে নেহি জী—উ হামারা দেশওয়ালী হ্যায়—

আরে ও কিষেণ ভাইয়া—লোকটা চিৎকার করে ডাকে।

কিষেণলাল সিদ্ধির নেশায় একটা খাটিয়ার উপর চিত হয়ে পড়েছিল. সাড়া দেয়—

কেয়া-রে, রোটি তৈয়ারী হো গেয়ি কি নেহি—

আরে দেখো তো তুমহারা কৌন দেশওয়ালী আদমী আয়া—

কৌন রে—

এগিয়ে আসে লোকটা।

নমস্তে কিষেণলালজী—

নমস্তে—কৌন হো তুম—

ম্যায় ছেদীলাল হু—

ছেদীলাল কৌন—মিশিরকো ভাতিজা?

হাঁ, হাঁ—

আরে তুম দিল্লীমে নোকরি লেকর গিয়া থা না?

হাঁ চাচাজী—

তব্?

ও নোকরি ছোড় দি মুঝে।

ছোড় দি—কিউ রে?

কা করি চাচাজী, নোকরি ও আচ্ছাই থা, লেকেন মুঝে দিল নেহি লাগা হুয়া—

তা তুমহারা চাচাজী—রোশনকা তবিয়ৎ কেইসা হ্যায়—

আচ্ছাই হ্যায়। একঠো বাত থা আপকো সাথ চাচাজী—

কহো বেটা—

থোড়া বাহারমে আইয়ে—

কিউ—

চলিয়ে না—সব কোইকো সামনামে উ বাত নেহি হো সেকতা —জরুরী বাত হ্যায়—

আচ্ছা, চলো উধার—

অন্ধকার কোর্ট ইয়ার্ডের একপাশে এসে দুজনে দাঁড়ায়। কহো বেটা কেয়া বাত হ্যায়।

চাচাজী, হাম কুছ দিনতক পুলিসকা বড়াসাবকো কোঠিমে নোকরি করতা হ্যায়—

আচ্ছা—

হাঁ উহাঁ এক বাত শুনকর জলদি চলা আয়া—

কেয়া বাত, বেটা—

চম্পাবাঈকো আপ জানতেথে না—

হাঁ—উসিকো পাশ ম্যায়নে তো কহি সাল নোকরি কিয়া—বেচারী এক খুনকে মামলামে ফাঁস গিয়া—

শুনিয়ে চাচাজী, ওহি মামলাকে বারেমে ম্যায় আপকো পাশ আয়া—

কেয়া বাত হ্যায় বেটা—

মামলা ইসবকৎ হাইকোর্টমে চল রহা হ্যায় না—

হাঁ—

শুনিয়ে চাচাজী, পুলিস হারাধনকো দো চার রোজমেই গ্রেপ্তার করেগা—

কিউ, ও তো বেগুনাহ হ্যায়—

লেকেন পুলিসকো উস্‌কো বারেমে এইসা কুছ মিল গিয়া কি ফির উস্‌কো গ্রেপ্তার কিয়া যায়গা—

গ্রেপ্তার কিয়া যায়গা ? লেকন কিউ ?

আভি বোলানা এইসা কুছ্‌ মিলা—

লেকেন কেয়া মিলা—

রুপেয়া—

রুপেয়া !

হাঁ—নম্বরী নোট—যো নোট ওহি বদ্রীপ্রসাদকো রাতমে খোয়া গিয়া—

কিষেণলাল হঠাৎ চুপ করে যায়—

পুলিস আপকো বারে ভি—

কেয়া—

হাঁ—উলোগন বলনে চাতা হ্যায় কি, আপ দুনো মিল ঝুলকে ওহি রাতমে—

নেহি বেটা নেহি—রুপেয়াকে বারেমে ম্যায় কুছ নেহি জানতা হ্যায়—

লেকেন পুলিস বিশোয়াস নেহি করেগা—

তব্ কেয়া হোগা বেটা—

আপকো কেতনা মিলা সাচ্ কহিয়ে—বড়াসাব হামকো বহুৎ পেয়ার করতা হ্যায়—উসকো গোড় পাকাড়কে ম্যায় আপকো লিয়ে মাফি মাঙেগা—

বেটা মুঝে বাচাও—কিষণলাল এবার কেঁদে ফেলে।

ফিকর না করিয়ে—ম্যায় সামাল লেগা—লেকেন আপকো সব সাচ্ সাচ্ বাতানে পড়েগা—

হাঁ বাতায় গা—

তব্ আভি চলিয়ে হামারা সাথ—

কিধার—

আগর হারাধনকো মালুম পড় যায়গা তো উ আপকো ফাসায়গে—উসি লিয়ে হামারা কোঠিমে আপ চলিয়ে—উধারই রহেগা—

লেকেন বেটা—

ডরিয়ে মাত। হামারা সাব বহুৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়—চলিয়ে—

আভি ?

হাঁ—ইসিওয়কৎ—

কিষেণলাল তার লটবহর নিয়ে ছেদীলালের সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে উঠে বসে তখুনি।

শালা হারুই হামকো ফাসায়া—কিষেণলাল ট্যাক্সিতে বসে বলে।

আর ঐ দিন রাত্রে ঐ সময়—

হারাধনের বস্তির ঘরে হারাধন ও রাসমণির মধ্যে বচসা হচ্ছিল—

হারামজাদী, মিথ্যে বলবি তো গলা টিপে শেষ করে দেবো তোকে—হারাধন খিঁচিয়ে ওঠে হিংস্র কণ্ঠে।

ও—গলা অমনি টিপলেই হলো—তোমাকে আমি রেহাই দেবো তাহলে ভেবেছো—অলপ্পেয়ে অনামুখো মিনসে।

তুই আমার টাকা নিয়েছিস—বল কোথায় রেখেছিস—

না—আমি তোমার টাকা নিইনি—

তুই নিসনি তো ভূতে নিয়ে গেল—তুই ছাড়া আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়, টাকা কোথায় ছিল—কাল রাত্রে এখানে এসে চলে যাবার সময় আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, ঐ ফাঁকে হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছিস—

আ মরণ মিনসের—হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছিস! যেই বিয়ের কথা তুলেছি অমনি বুঝি বাহানা তুলেছিস!

বিয়ে—তোকে আমি বিয়ে করবো—একটা ঝি—বেশ্যা—

কি বললি—আমি ঝি—বেশ্যা—ও তাই এই ফটোক—বলতে বলতে রাসমণি গত রাত্রে হারাধনকে দেওয়া প্রহ্লাদের সেই ফটোটা আঁচলের তলা থেকে বের করে, বল, এ মাগী কে বল –

অ্যাঁই অ্যাঁই—আমার ফটো দে বলছি, রাসু—

না, দেবো না –

দে বলছি, নইলে খুন করে ফেলবো। হারাধন রাসমণির উপর সহসা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দুজনায় মারামারি খিমচাখিমচি শুরু হয়।

রাসমণিও কম শক্তি গায়ে ধরে না। হারাধন প্রথমটায় তাকে চিত করে গলা টিপে ধরলেও পরক্ষণেই রাসমণি তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসে।

বেশ-বাস বিশৃঙ্খল—বাঁধা খোপা খুলে যায়—চোখে মুখে হিংস্র-দৃষ্টি রাসমণির।

কিন্তু হাজার হলেও রাসমণি এক জোয়ান পুরুষের সঙ্গে পারবে কেন—হারাধন একটু পরেই তাকে আবার ফেলে দেয়।

ঐ সময় রাসমণি হারাধনের হাতে প্রচণ্ড এক কামড় বসিয়ে দেয় —ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে।

এলোপাথাড়ি চড় ঘুষি মারতে থাকে রাসমণির চোখে মুখে হারাধন, অনেক কষ্টে এক সময় হাবাধনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে পড়ে রাসমণি।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আচ্ছা রে অলপ্পেয়ে মিনসে—ডানা গজিয়েছে তোমার—আমিও রাসু গয়লানী—তোমায় আমি দেখবো—

যা যা—দেখবি—তুই করবি আমার কচুটা—

রাসমণি ঝড়ের বেগে বের হয়ে যায়।

২১

রাসমণির ঘরে পরের দিন রাত্রে—

চেতলায় একটা বস্তি—

তারই মধ্যে একটা ঘর নিয়ে ইদানীং ছিল রাসমণি।

রাসমণি তার ঘরের মধ্যে একটা টিনের বাক্স খুলে সব জামা কাপড় গোছাচ্ছিল। বাইরে থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল—

ওলো রাসু, একটি বাবু তোকে খুঁজছে রে—

বাবু—কে আবার এলো—

দেখ না—যান বাবু ভিতরে যান—এই ঘর।

ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ও কাঁচির কোঁচানো লোটানো ধুতি পরনে—হাতে একটা সোনাবাঁধানো ছড়ি, চোখে সোনার শৌখিন চশমা—কোঁকড়ান চুলে টেরি কাটা—সরু পাঁকানো গোঁফওলা এক ভদ্রলোক এসে রাসমণির ঘরে ঢুকল।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় রাসমণি সসম্ভ্রমে, কে আপনি—

ব্যস্ত হয়ো না রাসমণি—আমি তোমার কাছেই এসেছি—

আমার কাছে?

হ্যাঁ—হাটখোলার বসুদের নাম শুনেছো, সে-বাড়ির মেজবাবু আমি—তা আমাকে বসতে দেবে না রাসমণি—

রাসমণি যেন কেমন বিস্ময়ে থতমত খেয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে

তার কোন শব্দই বের হয় না।

তার মাঠ-কোঠার ঘরে কে এলো!

কে উনি!

ভদ্রলোকটি আবার বলেন, কি হলো—চিনতে পারছো না! আমায় তুমি তো—

আজ্ঞে—

বসতে দেবে তো—

আজ্ঞে—

তাড়াতাড়ি রাসমণি একটা টুল এগিয়ে দেয়।

রাসমণি—বাবু বলেন, আমি বাপু স্পষ্ট কথার মানুষ—আদালতে চম্পাবাঈয়ের মামলা শুনতে গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোমায় প্রথম দেখেই আমি আর তোমাকে ভুলতে পারিনি—

ও শুধু অচিন্ত্যনীয়ই নয়, স্বপ্নাতীত বুঝি রাসমণির কাছে।

হাটখোলার মেজবাবু—তার রূপে মুগ্ধ। তার ঘরে এসে উপস্থিত—

রাসমণি যেন বোবা হয়ে গিয়েছে—

কিন্তু এখানে তো তোমার আর থাকা চলবে না—বালিগঞ্জে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে, সেখানে তোমাকে নিয়ে গিয়ে রাখব—কি বল. আপত্তি নেই তো—

রাসমণি কেঁদে ফেলে, বাবু—

ওকি, কাঁদছো কেন—ছিঃ কাঁদে না—

জেলখানার মধ্যে সেই ছোট্ট ঘরটিতে একটা চেয়ারে বসে তনিমা আর সামনে মেঝেতে বসে চম্পাবাঈ।

চম্পা তার কথা বলে যাচ্ছিল। আর নিবিষ্ট মনে শুনছিল সেই কাহিনী তনিমা।

চম্পা বলছিল—

যে মেয়েটির কথা শুনবার আপনার এত আগ্রহ, সেই হতভাগিনী মেয়েটির নাম শিউলী।

তনিমা চেয়ে থাকে, শিউলী—চম্পাবাঈয়ের মুখের দিকে।

চম্পা বলে, কে নাম রেখেছিল আমার শিউলী, জানি না। তবে জ্ঞান হওয়া অবধি ঐ নামেই সবাই আমায় ডেকে এসেছে—

হঠাৎ প্রশ্ন করে তনিমা—

আর তার নাম ?

জানি না।

শোননি কখনো ?

না।

শিউলী মাথা নীচু করে।

তারপর ?

একটা মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, জানতেও পারলাম না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় চিঠি এলো—তাকে কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য। যাবার সময় ও বলে গেল এক মাসের মধ্যে সে পুরুত নিয়ে এসে আমাকে বিয়ে করবে—বলতে বলতে হেসে ফেলে চম্পাবাঈ।

বিয়ে—ভবেতে গেলে আজও আমার হাসি পায়। কি বোকাই ছিলাম—না হলে ভাবি, আসবে সে—

আসেনি সে ?

না—কিন্তু তখনও বোকা ঐ শিউলী মেয়েটা বোঝেনি, কোন দিনই সে আর আসবে না—কোন দিনই আর আসবে না।

শিউলী আবার থামল।

তারপর শিউলি ?

—না, না—ও-নামে আমাকে আর ডাকবেন না। শিউলী কবেই মরে গিয়েছে—

না শিউলী, তুমি মরোনি—

শিউলী করুণ হাসি হাসে, না, সে মরে গেছে। তবে আজও শিউলীর সেই ভূতটা বোধ হয় মরেনি, তাই মধ্যে মধ্যে এখনো—

কি ?

না, কিছু না।

তা তুমি, সে যখন এলো না, তখন তাকে একটা চিঠি লিখলে না কেন, লেখাপড়া তো তুমি জানতে।

লিখেছিলাম।

লিখেছিলে।

হ্যাঁ—নামটাও জানতাম না কেবল শুনেছিলাম ঠিকানাটা—চার-পাঁচটা চিঠি তার কলকাতার সেই ঠিকানায় লিখেছি কিন্তু একটারও জবাব পাইনি—এদিকে তখন আমার শিয়রে শমন—যার বাড়া সর্বনাশ মেয়ে মানুষের আর নেই; সেই সর্বনাশ আমার দেহে দেখা দিয়েছে—উঃ সে যে আমার কি অবস্থা—

২২

এদিকে শিউলী প্রথম যেদিন বুঝতে পারল, সে মা হতে চলেছে, অকস্মাৎ বুকের ভিতরটা তার যেন কেঁপে উঠল।

দুই মাস এদিকে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, নীলাদ্রি কলকাতায় চলে গিয়েছে—

এবং শিউলীর দেহের পবিবর্তনটা আর কারো চোখে না পড়লেও সৌদামিনীর তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

তিনি একদিন সন্ধিৎসু কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে তোর?

কিছুই হয়নি তো মা—

তবু যেন সৌদামিনী দেবীর মন থেক সন্দেহটা যায় না।

তিনি কেবলই তাকান ওর চোখ-মুখের দিকে।

অথচ স্পষ্টাস্পষ্টি করে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারেন না—

এমন সময় এলো নীলাদ্রির চিঠিটা—

চিঠি পড়ে শোনায় সৌদামিনী দেবীকে শিউলীই—

নীলাদ্রি লিখেছে:

পিসিমা,

আগামী শনিবার এখান থেকে ট্রেনে বোম্বাই রওনা হচ্ছি—বোম্বাই থেকে সোমবার জাহাজে উঠবো। ইচ্ছা ছিল খুব, যাবার আগে তোমাদের ওখানে একটিবার ঘুরে যাবো কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। বিলেত থেকে ফিরে এসে আবার দেখা হবে। আমার প্রণাম নিও।

তোমার স্নেহের নীলু—

চিঠিটা পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন শিউলীর মাথাটার মধ্যে কেমন করে ওঠে।

সে তাহলে সত্যি সত্যিই এলো না আর—

কিন্তু এদিকে যে তার সঙ্গীন অবস্থা—আর তো চেপে রাখা যাবে না। সৌদামিনীর চোখে পড়েছে—সন্দেহও নিশ্চয়ই তাঁর হয়েছে।

এখন কি হবে ?

মাথাটা ঘুরে যায় হঠাৎ যেন শিউলীর—অকস্মাৎ সব যেন অন্ধকার হয়ে যায়—মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়।

সৌদামিনী চেঁচিয়ে ওঠেন, একি—কি হলো—কি হলো—

তাড়াতাড়ি সৌদামিনী অচেতন শিউলীর মাথাটা কোলে তুলে চোখে-মুখে জল দেন, মাথায় বাতাস করতে থাকেন আর কেষ্টকে বলেন, ছুটে ডাক্তাববাবুকে গিয়ে ডেকে আন কেষ্ট—বলবি, মা বলেছেন এখুনি চলে আসতে।

কেষ্ট ছুটে যায়।

একটু পরে জ্ঞান ফিরে আসে শিউলীব। চোখ মেলে তাকায়, মা—

কেমন আছিস এখন—

ভাল—

উঠে বসবার চেষ্টা করে শিউলী কিন্তু সৌদামিনী দেবী বাধা দেন, না, না—এখন শুয়ে থাক—

আমাব কিছু হয়নি, মা—

শুয়ে থাক—উঠতে দেন না সৌদামিনী শিউলীকে।

একটু পরে ডাক্তার এলেন, কার অসুখ—

আসুন ডাক্তারবাবু, দেখুন তো মেয়েটাকে—কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে—মুখ শুকিয়ে গেছে—চোখের কোলে কালি—

বৃদ্ধ ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর সৌদামিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন মা পাশের ঘরে, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—

সৌদামিনী ডাক্তারকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন।

মা—

বলুন!

মেয়েটি তো দেখছি অন্তঃসত্ত্বা।

সেকি!

হ্যাঁ মা—অন্য কোন রোগ নেই।

সৌদামিনীর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে, এ কি সর্বনেশে কথা! শিউলী মা হতে চলেছে—

আপনার ভুল হয়নি তো ডাক্তারবাবু।

না বড়-মা—ডাক্তার মৃদু হাসলেন।

একটু পরে ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে সৌদামিনী পাশের ঘরে ঢুকে প্রথমেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

শিউলী ইতিমধ্যে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পদশব্দে সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

শিউলী—

মা—

বল—সত্যি কথা বল আমাকে—

ও মাথা নীচু করে।

বল হারামজাদী শীগগির, কে এ-কাজ করেছে—

নীরব। যেন পাথর শিউলী।

বল্—

তথাপি নীরব ও।

হারামজাদী তুই আমার স্নেহের এত বড় অপমান করলি! এমনি করে আমার মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিলি, এই জন্যই কি তোকে নিজের কাছে এনে খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলেছিলাম—বল শীগ-গির—বল কে সে—

শিউলী তথাপি চুপ। যেন বোবা।

ওরে বল—যেমন করেই হোক তার সঙ্গে তোর আমি বিয়ে দেবো। কোন ভয় নেই, তুই বল—

কোন কথাই বলে না শিউলী।

তর্জনগর্জন মিনতি সৌদামিনীর সব ব্যর্থ হয়।

তখন অনুনয় করেন, লক্ষ্মী মা বল—কে সে? আমার কাছে বল।

অকস্মাৎ যেন ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লেন সৌদামিনী—

তীক্ষ্ম অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, বল্—চুপ করে থাকলে আমি ছাড়বো না।

তথাপি নিরুত্তর শিউলী।

বলতে তোকে হবেই—

নিজের ঘরের মধ্যে আটকে রাখলেন সৌদামিনী শিউলীকে।

ঘরের মধ্যে একাকী বসে ছিল শিউলী।

রাত হয়েছে তখন—সৌদামিনী উপরে পূজোর ঘরে গিয়েছেন একটু আগে—

শিউলী ভাবছিল—আজই তো শনিবার—আজই তো মাঝরাত্রে যে ট্রেনটা এখান দিয়ে চলে যাবে, সেই ট্রেনেই চলে যাচ্ছে নীলাদ্রি বোম্বাই।

তারপর বিলেত।

যেমন করে হোক তার সঙ্গে একটিবার দেখা করতেই হবে। তাকে যে সব জানাতেই হবে। বলতে হবে, ওগো তোমার সন্তান যে আমার গর্ভে—আমি এখন কি করবো, বলে যাও—তুমি তো চললে—

সন্ধ্যা থেকেই আকাশে মেঘ করেছিল—

রাত নটার পর শুরু হয়েছিল ঝড় বৃষ্টি—তখনো সমানে বৃষ্টি ঝরছে।

সৌদামিনী দেবী উপরে ঠাকুরঘরে।

ঘর থেকে বের হয়ে এলো একসময় শিউলী পা টিপে টিপে—দরজাটা টেনে দিল ঘরের।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে খিড়কীর পথ দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

তারপর সেই বৃষ্টির মধ্যে পাগলের মত স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে মধ্যরাত্রে যখন সে স্টেশনে এসে পৌঁছল বৃষ্টির মধ্যে, নীলাদ্রির ট্রেনটা তখন স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বৃষ্টির জন্য সমস্ত কামরার শার্সি নামানো—শিউলী ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটতে থাকে আর চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে বার বার, নীলাদ্রি—নীলাদ্রি—

হঠাৎ একটা আলোকিত কামরার মধ্যে তার দৃষ্টি পড়ে, ভিতরে

উজ্জ্বল আলো।

ফার্স্ট ক্লাস কামরা—চারজন লোক বসে বসে তাস খেলছে আর হাসাহাসি করছে—ঐ—ঐ তো নীলাদ্রি--এক হাতে তার তাস, অন্য হাতে গ্লাসে তরল পদার্থ।

নীলাদ্রি--কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বর বের হয় না।

ইতিমধ্যে সবুজ আলো দুলিয়ে সিটি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে গাড়িটা চলে গেল—

আর সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল শিউলী।

২৩

নীলাদ্রি তাহলে চলে গেল।

কিন্তু কই তার মুখে তো কোন উদ্বেগ কোন চিন্তার ছায়াই দেখল না সে। পরম আনন্দে বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলতে খেলতে চলেছে।

তবে সেই বা কেন ছুটতে ছুটতে এসেছিল—এতদূর—এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে!

নীলাদ্রি তাকে ভুলে গিয়েছে---

বোকা নির্বোধ সে, তাই স্বপ্ন দেখেছিল--সত্যিই তো নীলাদ্রি রাজার ছেলে আর সে কি—কি তার পরিচয়—

দুটো দিন তাকে নিয়ে স্ফূর্তি করেছে।

প্রয়োজন ফুরিয়েছে—সম্পর্কও শেষ হয়েছে।

কেমন করে যে ফিরে এলো আবার গৃহে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শেষরাত্রে, শিউলী নিজেও জানে না।

সিঁড়িতে তখনো আলো জ্বলছে—

ও কে—সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সৌদামিনী—

কেষ্টা—

মা—

সত্যিই সৌদামিনী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর

দুচোখের দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝরছিল।

চিৎকার করে উঠলেন সৌদামিনী, কেষ্টা—

অল্প দূরেই কেষ্টা বোধহয় ছিল, সৌদামিনীর ডাকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে, মা—

কেষ্টারও ঐ সময় নজর পড়ে, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে শিউলী।

ভিজে শাড়িটা সারা শরীরে লেপ্টে আছে—

জলে-কাদায় নোংরা শাড়িটা।

মাথার চুল বিপর্যস্ত।

সৌদামিনী কেষ্টার দিকে তাকিয়ে বললেন—যা ওকে নীচে গুদামঘরে নিয়ে যা, আমি আসছি—

সৌদামিনী তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন।

কেষ্টা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

কেষ্ট শিউলীকে ধরে টানতে টানতে গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। একটু পরেই সৌদামিনী দেবী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন।

হাতে তাঁর একটা চামড়ার চাবুক।

চাবুকটা ছিল তাঁর স্বামীর—অবাধ্য চাকরবাকরদের তিনি ঐ চাবুক দিয়ে নিজের হাতে শায়েস্তা করতেন।

ঐ জানালাটার সঙ্গে বাঁধ ওকে—

কেষ্ট যেন আজ মৌকা পেয়েছে—অনেক দিনের আক্রোশ তার শিউলীর প্রতি। একটা হ্যাঁচকা টানে শিউলীকে টেনে নিয়ে গিয়ে জানালার গরাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলল শক্ত করে।

সৌদামিনী আরো সামনে এসে দাঁড়ালেন—চোখ দুটো তাঁর জ্বলছিল যেন। বললেন, বল কোথায় গিয়েছিলি—

ও নীরব দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

জবাব দে, নইলে এই চাবুক দিয়ে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেবো আজ আমি। বল, কোথায় গিয়েছিলি—জবাব দে—

শিউলী যেন পাথর।

বল এখনো—কে? কোন্ নাগরের কাছে গিয়েছিলি—কোথায় সারাটা রাত ছিলি?

শিউলীর সে-রাত্রে একবার ইচ্ছে হয়েছিল ঐ সময় চিৎকার করে সে বলে, সে আর কেউ নয় তোমারই আদরের ভাইপো—তোমারই

বংশধর গর্ভে আমার—

কিন্তু কোন কথাই সে বলে না।

বলবি না—তবু চুপ করে থাকবি—কেষ্টা, এই চাবুক নে—ওর পিঠের চামড়া তুলে দে—

কেষ্ট চাবুকটা হাতে নেয়।

মার চাবুক—চেঁচিয়ে ওঠেন যেন ক্ষিপ্তের মত সৌদামিনী।

হুইস্ করে শব্দ উঠল চাবুকটা আন্দোলিত হয়ে বাতাসে।

আছড়ে পড়ল শিউলীর গায়ে—যেন একটা সাপ ছোবল হানল।

মার—যতক্ষণ না ও বলছে, মার—আরো মার—মেরে ফেল ওকে—সৌদামিনী যেন পাগল হয়ে গিয়েছেন। পাগলের মত চেঁচাচ্ছেন।

চাবুকের পর চাবুক সপাং সপাং করে ওর সর্বাঙ্গে পড়তে থাকে—দাগা দাগা হয়ে কেটে ফুলে ওঠে শরীর তার। তবু একটা কথা বলে না শিউলী—একটা শব্দ বের হয় না তার মুখ দিয়ে।

সৌদামিনী মেয়েটার জিদ দেখে আরো ক্ষেপে যান।

কেষ্টকে বলেন, মার—আরো মার—হারামজাদীকে মেরে ফেল—এত বড় নষ্ট মেয়েমানুষ—

শেষটায় জ্ঞান হারাল শিউলী একসময় প্রহারের যন্ত্রণায়।

মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের কাছে ওর অসহায়ের মত।

থাক—দে, বাঁধন খুলে দে—হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন সৌদামিনী।

পড়ে গেল মেঝেতে ধুলোর মধ্যে শিউলীর অচৈতন্য প্রহার-জর্জরিত রক্তাক্ত দেহটা, বাঁধন খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল যেন।

থাক হারামজাদী এখানে পড়ে—

ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সৌদামিনী কেষ্টকে নিয়ে—তালা দিয়ে দিলেন গুদামঘরের দরজায়—চাবিটা হাতে নিয়ে উপরে চলে গেলেন!

অন্ধকার বদ্ধ-বায়ু ঘরের ধুলির মধ্যে চাবুকে চাবুকে জর্জরিত রক্তাক্ত অচৈতন্য দেহটা পড়ে রইল শিউলীর।

হঠাৎ কথার মাঝখানে চেঁচিয়ে ওঠে তনিমা, উঃ—কি অমানুষিক inhuman torture—কেন--কেন তুমি সেদিন নামটা বলে দিলে না, চম্পা—

ছিঃ—দু চোখে আজো চম্পার জল ভরে আসে। বলে, তাই কি পারি—তার এতবড় বিশ্বাসের অমর্যাদা কি করতে পারি—

বিশ্বাস—

তাই, সে যাবার আগে আমার হাত দুটো ধবে বলে গিয়েছিল, বিয়ে তোমার আমার হয়ে গিয়েছে অনেকদিন, শুধু মন্ত্রটা পড়া লৌকিকতাটুকু সমাজের স্বীকৃতিটুকুর জন্য -তবু সেটা যতদিন না হয়, এ-কথা কিন্তু বলো না। কেউ যেন জানতে না পারে বলে-ছিলাম, না গো না, ভয় নেই, বলবো না—আর বলতেই বা যাবো কেন—বলবার দায়িত্ব কি আমার—সে তো তোমার।

তারপর একটু থেমে আবার চম্পা বলে, তাছাড়া আমি কে—কি আমার পরিচয়—কে-ই বা আমায় চেনে—আমার নামের কলঙ্কের মূল্যই বা কি—কিন্তু সে কত নাম কত যশ কত বড় ঘরের ছেলে সে—তাকে কি ছোট করতে পাবি তার গায়ে কি ধুলো-কাদা মাখাতে পারি—

আচ্ছা চম্পা-

বলুন!

তার কথা তুমি আজো ভুলতে পারনি তাই না ?

চম্পা কোন জবাব দেয় না—

২৪

মিথ্যা নয়—নীলাদ্রি যখন প্রথম তনিমাকে শিউলীর কাছে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল, তনিমার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলাদ্রির অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে যেতে হয়েছিল তাকে এবং সবের মধ্যে তার ইচ্ছার লেশমাত্র ছিল না।

তার আদৌ ভাল লাগেনি, রুচিতেও বেঁধেছে জেনানা ফাটকে

গিয়ে একটা নিম্নশ্রেণীর হত্যাকারিণী রূপোপজীবিনির সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু সেই নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকটিই যখন তাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিতে লাগল, বিস্ময়ের সঙ্গে কেমন একটা কৌতূহলও যেন তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

তার একান্ত অনাগ্রহটাই শেষ পর্যন্ত যেন একান্ত আগ্রহে পরিণত হয়—সে দেখা করবেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে স্থির করে—আর তাই জেলাব সাহেবকে অনুরোধ জানায়।

তারপর দেখা হবার পর শিউলীর মুখ থেকে যখন সে তার সব কাহিনী শুনলো, একজন স্ত্রীলোক হিসাবে শিউলীর প্রতি মনটা তার মমতায় ও শ্রদ্ধায় তো ভরে ওঠেই, সেই সঙ্গে তার সকল দুর্ভাগ্যের কারণ ঐ নীলাদ্রিই, নিঃসংশয়ে জানতে পেরে তার প্রতি মনটা তাব বুঝি বিরূপ হয়ে ওঠে।

শেষ দিন জেনানা ফাটক থেকে বের হয়ে তনিমা তাই সোজা তার নিজ গৃহে চলে যায়। দুটো দিন গৃহের বাইরে পর্যন্ত যায় না।

চতুর্থ দিনে নীলাদ্রিই এলো তনিমার সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে, তনিমার গৃহে ঐ তাব প্রথম আগমন।

সুবালাই দরজা খুলে দিয়েছিলেন, কে আপনি।

আমি নীলাদ্রি চৌধুরী—তনিমা আছে?

আছে—

সে কি অসুস্থ?

বলতে পারি না।

তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—

তার ঘরেই সে আছে—যান—ঐ যে ঐ ঘরে—কথাটা বলে সুবালা সরে গেলেন।

তনিমা চুপচাপ একটা চেয়ারের উপর বসেছিল।

নীলাদ্রি এসে ঘরে ঢুকল, তনিমা।

কে—একি আপনি—তনিমা উঠে দাঁড়ায়।

দুদিন তুমি যাও নি—কি ব্যাপার তাই জানতে এলাম—

আমার রেজিগনেশন লেটার তো পাঠিয়ে দিয়েছি কাল—পান-নি!

না—কিন্তু রেজিগনেশন কেন ?

ইচ্ছে নেই আর কাজ করবার—

তোমার বাড়িতে প্রথম এলাম বসতেও বলবে না ?

বসুন।

নীলাদ্রি বসল একটা চেয়ারে। কিছুক্ষণ অতঃপর উভয়েই চুপ-চাপ।

তনিমা!

বলুন।

শিউলীর সব কথা জানতে পেরেছো ?

পেরেছি—

কথাটা বলে তনিমা আবার চুপ করে যায়।

সে-সম্পর্কে কিছু তোমার বলার নেই। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নীলাদ্রিই আবার কথা বলে।

না—

কিন্তু আমার যে জানা প্রয়োজন।

কি জানতে চান ?

সে হঠাৎ অমন করে সেখান থেকে কেষ্টার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল কেন ?

পালায়নি সে—

তবে ?

সত্যি শুনতে চান আপনি সে-কথা ?

শুনবো বলেই তো এসেছি—

তবে শুনুন—সে আপনাকেই লজ্জা, অপমান ও কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই সেদিন নিজের মাথায় সব অপরাধের বোঝা তুলে নিয়েছিল—

তনিমা—

আপনাকে সে কথা দিয়েছিল, মুখ খুলবে না, তাই আজও মুখ বুজে আছে—মৃত্যু পর্যন্ত থাকবেও, জানবেন—

দোহাই তোমার আমাকে সব কথা জানতে দাও—

কি জানতে চান আর ?

সব-কথা—

তবে শুনুন, আপনি যেদিন বিলেত যান—সে-রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে সে ছুটে গিয়েছিল স্টেশনে—ব্যাকুল হয়ে, কিন্তু কেন জানেন—আপনার সন্তান তখন তার গর্ভে ছিল বলে।

তনিমা—অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নীলাদ্রি।

হ্যাঁ—এবং ফিরে এলো যখন, আপনার পিসিমা তাকে দুশ্চরিত্রা সন্দেহ করে নির্মম বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেন, তবু সে মুখ খোলে-নি—তারপব সেই রাত্রেই কেষ্টার প্রচেষ্টায়, সে তাকে আপনার কাছেই পৌঁছে দেবে এই অশ্বাসে আপনার পিসিমার আশ্রয় থেকে নিয়ে পালায় কিন্তু কেষ্টার আসল রূপটা যখন খুলে গেল—তার লোভের হাত বাড়াল তার দিকে, তাকে আবার পালাতে হলো আত্ম-রক্ষার জন্য—

তারপর—

তারপর ভাগ্যের নিষ্ঠুর খেলায় হতে হলো একদিন তাকে চম্পাবাঈ—

আর তার সন্তান! তার কি হলো?

জানি না—

জানো না—

না—কিন্তু আর সে-সব কথা আজ আপনার জেনেই বা লাভ কি? পাববেন না তো আজ আর তার সেই অতীত কলঙ্ককে মুছে দিতে। চম্পাবাঈয়ের নামটা মুছে দিতে—শিউলী তো অনেকদিন আগেই মরে গিয়েছে।

আমি উঠি তনিমা—

নীলাদ্রি সহসা উঠে দাঁড়াল। তারপর শ্লথ পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং সোজা গেল লালবাজারে তার পরিচিত পুলিসের বড় একজন অফিসার মিঃ দে-র সঙ্গে দেখা করতে। অনেক কথা হলো তাঁর মিঃ দে-র সঙ্গে।

দিন দুই পরে এক রাত্রে।

দি মর্ডান ফার্মেসি।

রাত তখন বোধকরি এগারটা হবে। মডার্ন ফার্মেসির কম্পাউণ্ডার দ্বিজেন পাড়ুই দরজা বন্ধ করে ডিসপেনসারির

কাউণ্টারের উপরে শয্যাটি বিছিয়ে তার উপরে বসে শয়নের পূর্বে বেশ আয়েস করে একটি বিড়ি ধরিয়ে সবে গোটা দুই টান দিয়েছে, বন্ধ দরজার গায়ে টুক্‌ টুক্‌ শব্দ হলো।

আঃ, এ-সময় আবার কে জ্বালাতে এলো রে বাবা।

উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই একজন পুলিস অফিসার ও নীলাদ্রি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, নীলাদ্রির চোখে কালো গগলস্‌। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—কেয়ারিকরা গোঁফ।

থতমত খেয়ে যায় দ্বিজেন, কি—কি চান স্যর—আপনারা—।

আপনার নাম দ্বিজেন? পুলিস অফিসারই প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে পাড়ুই—

কম্পাউণ্ডার?

হ্যাঁ—

আপনার প্রেসক্রিপশন ও বিষের রেকর্ডের খাতা দুটো দেখতে চাই—

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি একটা বড ও একটা ছোট খাতা এগিয়ে দেয় —প্রথমে প্রেসক্রিপশন খাতা তার পরে বিষের খাতাটা খুলে পাতা ওলটাতে থাকে—এক এক করে—বিশেষ একটা তারিখে এসে পুলিস অফিসার তন্নতন্ন করে দেখতে থাকে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখের তারা দুটো যেন পুলিস অফিসারের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকায়।

গত আঠারই নভেম্বর আপনি ডিস্‌পেনসারিতে ছিলেন?—প্রশ্ন করেন অফিসার এবারে।

গত চার মাস কোথায়ও আমি যাইনি স্যর—আর সে-রাত্রে—ছিলাম বৈকি—

রাতটা আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিই, এ সেই রাত পাড়ুই মশাই—যে-রাত্রে চম্পাবাঈ বদ্রীপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোককে মদের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করে—

হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যর মনে আছে—সে-রাত্রে আমি ডিস্‌পেনসারিতেই ছিলাম আর আমিই ঘুমের ওষুধ সেই পাউডার তৈরি করে দিই হারাধনকে—

হারাধনকে আপনি চিনতেন?

চিনব না কেন, ভাল করেই চিনতাম—সে তো প্রায়ই এসে চম্পা-বাঈয়ের জন্য এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যেতো—

ডাঃ অধিকারীকেও আপনি চেনেন ?

চিনি—

নীলাদ্রিই এবারে প্রশ্ন করে, তুমি কটা পুরিয়া ঘুমের দিয়েছিলে সে-রাত্রে হারাধনকে ?

আজ্ঞে স্যর—চারটে পুরিয়া—দ্বিজেন বললে।

খাতায় যে প্রেসক্রিপশন লেখা আছে, ঠিক সেই ওষুধ দিয়েই পুরিয়া তৈরী করে দিয়েছিলে ?

নিশ্চয়ই।

অন্য কোন ওষুধ মেশাওনি ?

নিশ্চয়ই না, স্যর।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যখন ওষুধ তৈরী করছিলে, হারাধন তখন কোথায় ছিল ?

এইখানে বাইরে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

কতক্ষণ লেগেছিল তোমার ওষুধ তৈরী করতে ?

তা মিনিট কুড়ি তো হবেই।

সামনের ঐটিতেই তো সব Poisonous drugs থাকে ?

আজ্ঞে—

ওর সব রেকর্ড রাখা হয় নিশ্চয়ই—

হ্যাঁ স্যর, ঐ খাতাতেই পাবেন।

অ্যাট্রোপিনের শিশিটা দেখি।

দ্বিজেন আলমারি খুলে 'অ্যাট্রোপিনে'র শিশিটা বের করে আনল।

এতে কতটুকু ওষুধ আছে ?

ঐ Poisonous drugs-এর খাতাতেই আছে স্যর সব।

ওজন করে দেখ তো কতটা ওষুধ আছে ?

দ্বিজেন নীলাদ্রির নির্দেশে ওজন করল—কিন্তু দেখা গেল, শিশির ওষুধের পরিমাণের সঙ্গে খাতার পাতায় লেখা ওষুধের পরিমাণের মিল হচ্ছে না—প্রায় কুড়ি গ্রেণ মত কম।

খাতার সঙ্গে তো মিলছে না, দ্বিজেন ?

তাইত দেখছি স্যর—আশ্চর্য !

যখনই শিশি থেকে যতটুকু খরচ হয় খাতাতেই তো রেকর্ড রাখা হয়, তাই না ?

হ্যাঁ—

তবে ?

ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যর। গত চার মাসের মধ্যে তো ঐ শিশি থেকে অট্রোপিন ব্যবহার করা হয়নি।

নীলাদ্রি পুলিস অফিসারের মুখের দিকে তাকাল।

চোখে চোখে তাদের যেন কি ইশারা হয়ে গেল।

অতঃপর পুলিস অফিসার বললেন, এই শিশি আর খাতাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি—

কিন্তু স্যর, ঐ দুটো—

আমাদের একটু দরকার আছে—কাল-পরশুর মধ্যেই ফিরে পাবে এগুলো, পুলিস অফিসার বললে।

আচ্ছা স্যর—

নীলাদ্রি ও পুলিস অফিসার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আবার দিন দুই পরে—

ঘরের মধ্যে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নীলাদ্রি তার ছদ্মবেশটা বদলাচ্ছিল। ঘরের দরজায় টোকা পড়ল।

শিবদাস--আয় ঘরে আয়—

শিবদাস ঘরে এসে ঢুকল—হাতে কফির ট্রে।

দিদিমণি আজো আসেননি ?

আজ্ঞে না—

ঠিক আছে, তুই যা—

শিবদাস চলে গেল।

তনিমা ঐ সময় ময়দানে অন্ধকারে এক জায়গায় বসে ছিল—সে হতভাগিনী চম্পার কথাই ভাবছিল।

সত্যিই কি দুর্ভাগ্য মেয়েটার।

অথচ কি আশ্চর্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অত অত্যাচারেও মুখ

খুলল না।

নীলাদ্রিকে তনিমা সত্যিই ভালবেসেছিল।

চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে এসেই কেন যেন প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষটাকে ভাল লেগেছিল।

মানুষটার চরিত্রের মধ্যে একটা যেন উদ্ধত পৌরুষ ও দুর্জয় প্রতিজ্ঞা আছে। তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথাবার্তা—হাঁটা চলা সব কিছুই যেন আকৃষ্ট করেছিল তনিমাকে, তখনো অবিশ্যি নীলাদ্রি সম্পর্কে কোন কথাই শোনেনি তনিমা।

চাকরি নেবার পর ক্রমে ক্রমে নীলাদ্রি সম্পর্কে অনেক কথাই তার কানে আসে। লোকটা উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া এবং নারী জাতি সম্পর্কে নাকি একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে।

কিন্তু দিনের পর দিন নিকট সাহচর্য ও কোন দিন এতটুকু অসৌজন্য প্রকাশ পায়নি তার প্রতি নীলাদ্রির ব্যবহারে।

ধীরে ধীরে তনিমার মন নীলাদ্রির প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। ক্রমশঃ সেই আকর্ষণ আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে দিনের পর দিন—দুজনে পরস্পরের কাছাকাছি—ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

তাছাড়াও নীলাদ্রির চরিত্রের মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠতা ও আভিজাত্য ছিল, যেটা মুগ্ধ করেছিল তনিমাকে।

কিন্তু শিউলীর কাহিনী তার মুখ থেকে শোনবার পর নীলাদ্রির প্রতি তার সেই তীব্র আকর্ষণটা যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা নিয়েছে।

দুই নীলাদ্রিকে যেন তনিমা কিছুতেই মেলাতে পারছে না।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে এলো তনিমা।

সুবালা জেগেই ছিল—

দরজা খুলে দেন।

২৫

একটা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলার একট সুসজ্জিত ঘরে ঢালা-ফরাসের উপর বসেছিল নীলাদ্রি হাটখোলার মেজবাবুর বেশে—পাশে বসে রাসমণি—

তাহলে তুমি ভালবাসতে হারাধনকে, রাসমণি—

ও-হারামজাদার কথা আর বলবেন না—ছোটলোক—

কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে একদিন, সে তোমাকে ভালবেসেছিল—

মুখে আগুন অমন ভালবাসার—খ্যাংরা মারি হাজারটা! স্বার্থ—বুঝলেন বাবু স্বার্থ—তখন তো বুঝিনি, মতলব করে সোহাগ জানাচ্ছে।

মতলব! কার—

নয়ত কি—ফাঁসিয়ে দিতে পারি না—সারাটা জীবন জেলের ঘানি টানাতে পারি এখনো হারামজাদাকে, বুঝলেন বাবু—

যাঃ, কি যে বলো—

মাইরি বলছি বাবু—এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

আহা, থাক থাক—শোন, আজ আমি উঠবো—এই দুশো টাকা রাখ—দু-চার দিন হয়ত আসতে পারব না—

হাটখোলার মেজবাবু উঠে দাঁড়ায় যাবার জন্য।

এখুনি উঠবেন—

হ্যাঁ—কাজ আছে একটু—

আসেন আর চলে যান বাবু—একটা রাতও তো আজ পর্যন্ত কাটালেন না এখানে—

কাটাবো কাটাবো—বলতে বলতে আদর করে রাসমণির থুতনিটা নেড়ে দেয়। একটা রাত কেন, রাতের পর রাত কাটাবো—চলি আজ।

হাটখোলার মেজবাবু ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তনিমা শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল শিউলীর কথাই।

শিউলী বলেছিল—

কতক্ষণ ঐ অবস্থায় অন্ধকার গুদামঘরটার মধ্যে ধূলিভরা মেঝের উপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, জানে না শিউলী—

একসময় জ্ঞান ফিরে এলো। অন্ধকার—

অসহ্য বেদনায় যেন শরীরটা একেবারে অসাড়, অবশ—

আবার চোখ বুজল—

কখন সকাল হলো—কখন দিন ফুরিয়ে গেল বাইরে, শিউলী-জানতেও পারল না। কখন রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে এলো, তাও জানল না।

পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এলো যখন, ধীরে ধীরে উঠে বসে শিউলী, অন্ধকারেই মেঝের উপর।

অন্ধকারে একটা শব্দ—

দরজা খোলার শব্দ যেন।

চোখ তুলে তাকাল শিউলী—এক হাতে একটা হ্যারিকেন, অন্য হাতে একটা খাবারের থালা। কেষ্ট এসে ঘরে ঢুকল।

বাঃ এই যে উঠে বসেছিস দেখছি—নে খেয়ে নে—

তুই করে কথা বলল আজ কেষ্ট—অথচ এতদিন তুমি দিদিমণি ছাড়া তাকে সম্বোধন করবার সাহস ছিল না—

কেষ্ট বলে, আমি কি আর ইচ্ছে করে তোকে মেরেছি রে—গিন্নি-মার হুকুম—জানিস তো—বুক আমার ভেঙে গেছে রে তোকে মারতে -

কেষ্টর কথার কোন জবাব দেয় না শিউলী।

খেয়ে নে না—ক্ষিদে পায়নি ?

জবাব নেই শিউলীর।

এখানে আর থাকবি কি করে—গিন্নীমা যেরকম চটে গেছেন, হয়ত আবার বেত মারাবেন। তার চাইতে এক কাজ করবি ?

কি ?

আমি তোকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারি—

পার—পার কেষ্ট, আমাকে এখান থেকে বের করে দিতে—আগ্রহভরে প্রশ্ন করে শিউলী।

পারি—কিন্তু আমি যা চাইবো, দিতে হবে—

কেষ্টর চোখ দুটো অন্ধকারে চকচক করে ওঠে।

পারি—

কিন্তু স্বল্প আলোয় কেষ্টর চোখের দিকে তাকিয়ে শিউলী যেন কেমন গুটিয়ে যায়—

কি বল, যাবি ?

না—

কেন রে? শোন আমি তোকে দাদাবাবুর কলকাতার বাসায় পৌঁছে দেবো—

দেবে—সত্যি দেবে, বলছো?

দেবো।

তবে আমি যাবো—

ঠিক তো?

ঠিক।

ঠিক আছে—জেগে থাকিস রাত্রে, আমি আসবো—

কেষ্ট চলে গেল।

বসেই ছিল অন্ধকারে শিউলী।

একসময় আবার ঘরের তালা খুলে গেল—অন্ধকারে কেষ্টর গলা শোনা গেল, আয় বের হয়ে আয়—

বের হয়ে এলো শিউলী গুদামঘর থেকে দু রাত পরে।

সেখান থেকে স্টেশনে—সেই রাত্রেই গাড়িতে উঠে বসল ওরা।

শেষরাত্রের দিকে ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছে—কেষ্ট ওকে বলল, চল, এখানে নামব—

এখানে কেন, কলকাতায় যাবে না?

যা বলছি, শোন—

হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিল কেষ্ট শিউলীকে। ঐ জায়গা থেকেই মাইল দুই দূরে কেষ্টর বাড়ি।

কেষ্ট শিউলীকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তুলল।

তারপর কটা রাত কি অকথ্য অত্যাচার—কোনমতে এক রাত্রে শিউলী পালাল সেখান থেকে। রাস্তায় বের হয়ে ছুটতে লাগল।

সারাটা রাত ধরে ছোটে।

রাত শেষ হয়ে আসে। একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। কিন্তু ও জানত না যে ইতিমধ্যে কেষ্ট ওর পালানোর কথা জানতে পেরে ওকে অনুসরণ করে আসছিল—পিছন পিছন—

হঠাৎ দূরে শিউলী কেষ্টকে দেখতে পায়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দেয়, দরজাটা খুলুন না—কে আছেন, দরজাটা খুলুন না দয়া করে—আমার বড় বিপদ—

খুলে গেল দরজা—হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে দরজাটা আটকে দিতেই একটি মহিলাকে শিউলী দেখতে পেল। মহিলার বয়স হয়েছে।

কে তুমি—মহিলা শুধান।

আমাকে বাঁচান একটা শয়তান আমার পিছু নিয়েছে—

কোন ভয় নেই—তুমি বোস।

ভদ্রমহিলা একজন নার্স। মিস দাশ—

মিস দাশই ওকে আশ্রয় দিলেন। এবং যথাসময়ে একদিন একটি মেয়ে-সন্তানের জন্ম দিল শিউলী।

শিউলী বলে, একে নিয়ে এখন আমি কি করি, দিদি—কি পরিচয় দোবো ওকে ?

তুমি অত ভাবছো কেন ? একটা ব্যবস্থা হবেই।

একটা ব্যবস্থা হবে, মিস দাশ বললেও শিউলী যেন ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারাই দেখতে পায় না—

মেয়ে একটু একটু বড় হয়—হামা দেয়—হাঁটে—

কিন্তু মানুষ করতে হবে মেয়েকে—আর সবচাইতে বড় কথা—তার মত দুর্ভাগ্যের বোঝা যেন জীবন-ভোর ওকে টেনে বেড়াতে না হয়।

মন স্থির করে ফেলল শিউলী—মেয়েকে মানুষ করে তুলতে হলে অর্থেরও প্রয়োজন। মিস দাশের হাতে চিরদিনের মত সন্তানকে তুলে দিয়ে এক রাত্রে শিউলী কলকাতায় চলে এলো।

দিদি, যতদিন না আমি টাকা রোজগার করে পাঠাতে পারি, তুমি ওর সব কিছু চালিয়ে নিও—টাকা আমি রোজগার করবই—রোজগার হলেই পাঠিয়ে দেবো—বলেছিল শিউলী।

কিন্তু রোজগারের জন্যে কলকাতায় যাবার কি দরকার ছিল রে — এখানে থেকেও তো—

না, দিদি—ওর সঙ্গে তো কোন সম্পর্ক আজ থেকে আর আমার রইলো না।

সে কি রে—

হ্যাঁ—আমার সম্পর্কে ওকে কি আমি কলঙ্কিত হতে দিতে পারি— আমার দুর্ভাগ্যের জন্য ও তো দায়ী নয়—

কিন্তু একদিন ও যদি জানতে চায়, কে ওর মা কে ওর বাপ—

বলো—বলো তোমারই সন্তান ও—তুমি-ই ওর মা। তবে যদি কোন দিন তেমন প্রয়োজন হয় আমাব মৃত্যুর পর ওকে জানাতে পার ইচ্ছে করলে ওর দুর্ভাগিনী মায়ের কথা।

শিউলী ভাবছিল কলকাতায় পৌঁছতে পারলে, সে কি একটা পথ খুঁজে পাবে না—নিশ্চয়ই পাবে।

কিন্তু কলকাতা শহরে পা দেবার পরই শিউলী বুঝতে পারে, শহরটা যতহ বড় হোক যতই ঘব বাড়ি ও মানুষ জন থাক না কেন, এখানে তার মত এক যুবতী নিরাশ্রয় মেয়ের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার কোন একটা উপায় খুঁজে পাওয়াই বুঝি দুঃসাধ্য।

বিশেষ করে তাব দেহের ভরা যৌবন আর রূপটাই বুঝি তার বাঁচবার পথে সব চাইতে বড় কাঁটা।

পথ চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে যেন প্রতিটি মানুষের চোখের দৃষ্টি তাকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, কেবলই মনে হয় তার, এ কোথায় এলো সে। পথে পথে হেঁটে হেঁটেই চার-পাঁচটা দিন কেটে গেল শিউলীর।

ঝিয়ের কাজের বিনিময়েও কোথায়ও সে একটু আশ্রয় পায় নি। ক্রমশঃ হাতের পয়সাও ফুরিয়ে আসে। ফুটপাথে বসে বসেই বিশ্রাম নেয়—চোখ বুজতেও বুঝি সাহস হয় না প্রথম রাত্রির এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর।

ক্লান্ত-অবসন্ন শিউলী ঘুমিয়ে পড়েছিল একটা গাছের তলায় প্রথম রাত্রে—কোথাও কারো গৃহে কোন আশ্রয় না পেয়ে—হঠাৎ মাঝরাত্রে একটা বিজাতীয় স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল।

একটা জোয়ান মদ্দ কুলী শ্রেণীর লোক তাকে প্রায় বুকের মধ্যে চেপে ধরেছে—শিউলী জানত না, লোকটা দুপুর থেকে তাকে অনু-সরণ করছে—এবং কেমন কবে যেন জানতে পেরেছিল তার নিরাশ্রয় অবস্থার কথাটা।

ধড়মড় করে উঠে লোকটাকে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালায় শিউলী—লোকটাও তার পিছু নেয়—ভাগ্যি একটা পুলিসকে পেয়ে ছিল রাস্তায়—কোনমতে রক্ষা পেয়েছিল তারপর।

তার পর থেকে রাত্রে আর ঘুমতে সাহস হয়নি।

শ্রান্ত-ক্লান্ত শিউলী বিকেলের দিকে চার দিনের দিন গঙ্গার ঘাটে এসে বসেছিল—এক প্রৌঢ় গঙ্গার স্নান করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছে, ও জানতেও পায়নি— ।

স্নানের পর প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার সামনে এসে দাঁড়ায়, তুমি কে গা ? কাদের বাড়ির মেয়ে ? তখন থেকে দেখছি, বসে আছো, এখানে কোথায় থাক ?

শহরে আমি নতুন এসেছি—

প্রৌঢ়ের কথায় কেমন আকৃষ্ট হয়েই জবাব দেয় শিউলী ।

এখানে কে আছে তোমার ?

কেউ নেই—

কোন আত্মীয় স্বজন, কেউ নেই ?

না ।

বিয়ে থা হয়নি, মনে হচ্ছে ।

না ।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো নাকি ?

বাড়ি আমাব নেই—

আচ্ছা, তাহলে কি করবে ?

জানি না ।

আমার বাড়িতে যাবে, কাছেই কালীঘাটে আমি থাকি ।

আমায় চাকরি দেবেন একটা ?

কি কাজ জান ?

রান্নাবান্না—ঝিয়ের সব কাজ জানি, চাকরি দেবেন ?

চল তাহলে—আমার বাড়িতেই কাজ দেবো ।

শিউলী উঠে দাঁড়াল ।

ছোট্ট সংসার ভদ্রলোকের । স্ত্রী গত হয়েছে—একটি মেয়ে, দুটি ছেলে আর নিজে । .

বড় ছেলেটি বাইরে বিদেশে কোথায় চাকরি করে—ছোটটি কাছেই থাকে, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ—কোন একটা কারখানায় চাকরি করে ।

মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, শ্বশুরবাড়ি কৃষ্ণনগর ।

কটা দিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল, কিন্তু এক রাত্রে ঘুম ভেঙে

গেল, আবার বিজাতীয় স্পর্শে।

প্রৌঢ় ঐ দিন সকালে মেয়ের বাড়িতে কৃষ্ণনগর গিয়েছে—বাড়িতে ছিল মাত্র ছোট ছেলে ও সে।

আস্তে উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না—

প্রৌঢ়ের ছোট ছেলে রতন—

চুপ—চেঁচাবি তো খুন করে ফেলবো—

রতন ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর—আবার সেই রাত্রেই পথে গিয়ে নামল শিউলী—

তার পরই দিন কয়েক বাদে আশ্চর্য রকম ভাবে বাঈজী সরস্বতী বাঈয়ের সঙ্গে দেখা হলো—বাঈজী তাকে গৃহে আশ্রয় দিল।

তার কাছেই গান-বাজনা শিখল শিউলী—কিন্তু সরস্বতীবাঈও তাকে নিষ্কৃতি দিল না - কৌশলে ঐ গান-বাজনার সঙ্গে টেনে নিয়ে দাঁড় করাল বেশ্যা বৃত্তির মধ্যে।

শিউলী যেন হাঁপিয়ে ওঠে। মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্‌ করে।

ঐ সময়ে এলো তার জীবনে এক ধনী জমিদারপুত্র, তাকে আশ্রয় করেই শিউলী নতুন ঘর বাঁধল অন্যত্র একদিন।

বছর দুই পরে লোকটা মারা যখন গেল, শিউলী নিজের পায়ে নিজে তখন দাঁড়িয়েছে।

শিউলী মরে গেল। জন্ম নিল চম্পবাঈ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐ সময় দেহে নানা ব্যাধি দেখা দেয়—অসুস্থ হয়ে পড়ে শিউলী। তবুও অর্থের প্রয়োজন—বিশেষ করে মেয়ে রাণুর জন্য। তাই অসুস্থ অবস্থাতেও নাচ-গান করতো হতো তাকে।

এইভাবেই যখন চলছে, তখন এক রাত্রে এলো দুর্ভাগ্যের চরম আঘাত।

বদ্রীপ্রসাদের হত্যাপরাধে তাকে পুলিস গ্রেপ্তার করলো।

নীলাদ্রি সব শুনেছিল তনিমার মুখ থেকে—আগাগোড়া সমস্ত কথা।

তনিমা বলছিল, আশ্চর্য ভালবাসা—আশ্চর্য শ্রদ্ধা—শুধু আপনার জন্যেই সে মুখ খোলেনি—সমস্ত দুর্ভাগ্য ও চরম লজ্জাকে নিঃশব্দে মাথা পেতে নিয়েছে।

আবার আদালত গৃহ।

প্রসিকিউশন কাউন্‌সেল সাম আপ করছিলেন, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা এইটাই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, it's a case of deliberate murder—অর্থের জন্য বাইজী চম্পা হতভাগ্য বদ্রীপ্রসাদকে সে-রাত্রে তীব্র বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। মহামান্য বিচারপতি ও মাননীয় জুরি মহোদয়গণকে আমার অনুরোধ যে সর্বদিক ভালভাবে বিবেচনা করে এই মামলায় যেন তাঁরা তাঁদের সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন।

প্রসিকিউসন্ কাউন্‌সেল বসবার পরই আসামীর পক্ষের ব্যারিস্টার অনিল সেন উঠে দাঁড়াল—মি লর্ড! চম্পাবাঈয়ের কেসের ব্যাপারে আমার আরো কিছু বলবার আছে—

বলুন—জজ বললেন।

আমার সিনিয়র ব্যারিস্টার নীলাদ্রি চৌধুরী এই মামলার সমস্ত স্বাক্ষীদের আরো কিছু প্রশ্ন করতে চান—

কিন্তু সমস্ত প্রশ্ন ও জেরাইত শেষ হয়ে গিয়েছে—প্রসিকিউসন্ কাউন্‌সেল বলেন।

আমার বন্ধু লার্নেড্ প্রসিকিউসন কাউন্‌সেলের কথা আমি অস্বীকার করছি না—কিন্তু ইতিমধ্যে পুলিস আরো কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যাপার উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছে, যার দ্বারা আমরা আশা করছি, প্রমাণ করতে পারবো, চম্পাবাঈ সম্পূর্ণ নির্দোষ! এই আমাদের পিটিশন—

জজ সাহেব পিটিশনটা পড়ে ব্যারিস্টার সেনের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

আদালত সেদিনকার মত স্থগিত থাকলো।

কিন্তু মুশকিল বাধল নীলাদ্রির ওকালতনামা নিয়ে।

জেলে গিয়ে পরের দিন অনিল সেন যখন চম্পাবাঈকে সেই ওকালতনামায় সই করতে বললেন, চম্পা সই করতে অস্বীকৃত হলো।

বললে, না—কোন প্রয়োজন নেই আমার—

এ তুমি কি বলছো চম্পাবাঈ—তুমি কি বাঁচতে চাও না ?

না। এ-সব আর আমার ভাল লাগছে না।

পাগলামী করো না, চম্পা আমরা প্রমাণ করবো, তুমি নির্দোষ—

আমি নির্দোষ নই—তাছাড়া কারো করুণা আমি চাই না—

করুণা—

নয় তো কি! অত বড় ব্যারিস্টার চৌধুরী সাহেবকে দেবার মত পয়সা তো আমার নেই—

তিনি তো কিছু চান না—বিনা পারিশ্রমিকেই তিনি তোমার কেস defend করবেন, বলেছেন—

কিন্তু, কেন বলুন তো।

একজন নিরপরাধিনীর ফাঁসী হবে, হয়ত তাই তিনি—

তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন, কোন প্রয়োজন নেই আমার—

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন অনিল সেন।

নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করে, কি হলো, সেন!

না। সে সই করলো না। বললে, কারো দয়া সে চায় না।

তাহলে—

বুঝতে পারছি না, মিঃ চৌধুরী—কি করা যায়—

ঠিক আছে, আজকের রাতটা আমি ভেবে দেখি—

সেই রাত্রেই নীলাদ্রি তনিমাকে ফোন করল। তনিমা আর আসেনি এ পর্যন্ত তারপর।

তনিমা, একটিবার আসবে—তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

কি প্রয়োজন—

চম্পার ব্যাপারে—

তার ব্যাপার তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে—

না তনিমা, এখনো শেষ হয় নি—এখনো আমার শেষ কাজটুকু বাকী আছে—

আমি পারবো না।

Please—একটিবার এসো।

এলো তনিমা।

কেন ডেকেছিলেন ?

বোস।

না, বলুন।

শিউলীকে যেমন করে হোক ফাঁসীর দড়ি থেকে আমায় বাঁচাতেই হবে—আর সে-ব্যাপারে একমাত্র তুমিই আমাকে আজ সাহায্য করতে পার—

আমি!

হ্যাঁ—

ওকালতনামার ব্যাপারটা খুলে বললে অতঃপর নীলাদ্রি তনিমাকে—যেমন করে হোক আমাকে তার সইটা ওকালতনামায় করিয়ে আনতেই হবে—নচেৎ আমার সব শ্রম ব্যর্থ হবে—

কিন্তু আমি—

আমি জানি, তোমাকে সে ফিরিয়ে দেবে না।

কিন্তু আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আজ তার defend নিয়ে আদালতে গিয়ে দাঁড়ালে আপনার কত বড় ক্ষতি হবে—

কোন ক্ষতিই আজ আমার কাছে ক্ষতি নয়, তনিমা—বলবো, আমি বলবো প্রয়োজন হলে কি সম্পর্ক আমার ঐ চম্পাবাঈয়ের সঙ্গে, কে আজ তার চরম দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী।

তনিমা বললে, না, না—এ অসম্ভব—এ কিছুতেই হতে পারে না—এ আপনাকে আমি কিছুতেই করতে দেবো না।

শান্ত সুন্দর হাসির একটা আভাস ফুটে ওঠে নীলাদ্রির ওষ্ঠ-প্রান্তে। এবং শান্তকণ্ঠে সে বলে, তুমিও না একজন নারী, তনিমা—এ-কথাটা তুমি বলতে পারলে কেমন করে! আর কেউ না জানুক, তুমি তো ওর সব জেনেছো—

তবু—তবু এ হতে পারে না—এভাবে আপনাকে আমি আজ সবার সামনে ধুলো-কাদার মধ্যে এসে দাঁড়াতে দেবো না। আপনার ভবিষ্যৎ এমনি করে নষ্ট হয়ে যেতে দেবো না—না কিছুতেই না—

তনিমা—

না, না—তা আপনি পারেন না—আপনাকে এ কাজ আমি করতে দেবো না—দু হাতে মুখ ঢাকল তনিমা।

তনিমা যেন আর দাঁড়াতে পারে না।

সোফাটার উপর বসে পড়ে দু হাতে মুখ ঢাকে।

আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

অকস্মাৎ যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে নীলাদ্রি, কয়েকটা মুহূর্ত তার গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হয় না।

সে অবনতমুখী ক্রন্দনরতা তনিমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কয়েকটা মুহূর্ত।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তনিমার কাছে দাঁড়ায়। ওর মাথায় একখানি হাত রেখে বলে, আশ্চর্য—এ যে আমি কোন দিন ভাবতেও পারিনি—

তনিমা তখনো দু হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

নিলাদ্রি আবার বলে, কিন্তু তনিমা, যে-গিঁট একদিন আমারই জন্যে পড়েছে, সে-গিঁট যে আজ আমাকেই খুলতে হবে।

না, না—

তাছাড়া আমার অন্যায়ের, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি না করলে আর কে করলে, বল! আর কেবল প্রায়শ্চিত্তই তো নয়—ও যে আজ নীলাদ্রি চৌধুরীর বিবেকের শেষ জবাব—শেষ বিচার—

অশ্রুভেজা দুটি চোখ তুলে তনিমা তাকাল নীলাদ্রির দিকে—

হ্যাঁ তনিমা, কয়েকটা মন্ত্রপাঠ ও খানিকটা অনুষ্ঠানই তো বিবাহবন্ধনের একমাত্র ও শেষ কথা নয়—তা যদি হতো, সেদিন অমন করে নিরঙ্কুশ চিত্তে কি শিউলী তার সর্বস্ব আমার হাতে তুলে দিতে পারত, না এমনি করে এই দীর্ঘ বার বৎসর ধরে আমার সমস্ত অন্যায় ও অপরাধের বোঝাটা নিঃশব্দে ও ওর বুকের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারত!

আপনি—কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না তনিমা।

নীলাদ্রি তখনো বলছে, ও তো আজ চম্পাবাঈ নয়—শিউলীও নয়—নীলাদ্রি চৌধুরীর সন্তানের জননী—

বলতে থাকে নীলাদ্রি, কি যন্ত্রণা যে এই কয়দিন সহ্য করেছি তনিমা—যদি জানতে—তারপর আমার যখন শেষ মীমাংসায় পৌঁছালাম—সমস্ত যন্ত্রণার যেন অবসান হলো।

গেল তনিমা আবার সেই জেনানা ফাটকে।

চম্পাবাঈ এসে সামনে দাঁড়াল।

কি চাই! আবার কেন এসেছেন?

এই ওকালতনামাটায় তুমি সই করে দাও, চম্পা—

না—

চম্পা—

না, না—কেন বিরক্ত করছেন এসে বার বার আমাকে আপনারা। আমি তো বলেই দিয়েছি, সই আমি করবো না। মুক্তি আমি চাই না—প্রয়োজন নেই আমার—

ভুল একটা যদি সে করেই থাকে চম্পা, তার কি কোন ক্ষমা নেই?

ভুল। ভুল আবার কিসের—ভুল করতে যাবেন কেন তিনি, ভুল যদি কেউ করে থাকে, সে তো আমি—

শিউলী, জান না তুমি, সে আজ কত অনুতপ্ত—

অনুতাপ—অনুতাপ আবার কিসের আর কেনই বা অনুতাপ। তাকে বলবেন—তার প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। কোন নালিশ নেই।

শিউলী—

অনুতাপ। আজ বুঝি অনুতাপের কথা মনে হয়েছে দীর্ঘ বার বছর পরে। কোথায় ছিল তার এই অনুতাপ এতদিন! কোথায় ছিল তার বিবেক—সেদিন এক সরল বোকা গ্রাম্য মেয়ের ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তার সর্বস্ব হরণ করে চলে এসেছিলেন—আপনি বলতে চান, আজ তাঁরই কাছে গিয়ে আমি ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দাঁড়াবো। না—কিছুতেই না—

কিন্তু শিউলী, তোমার সন্তান—

সন্তান—

হ্যাঁ, তোমার সন্তান—তুমি কি চাও না, সে তার জন্মদাতার পরিচয় পাক—

শিউলী যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

চাও না কি তুমি, সে সমাজের দশজনের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াক, আজ সে ছোট, কিন্তু একদিন সে বড় হয়ে জানতে চাইবে যখন, সে তার সত্যিকারের জন্মদাতা বাপের পরিচয়টা—

নাই বা জানল সে-কথা—

কেন—কেন জানবে না। কোন্ অধিকারে তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবে তুমি শিউলী, বলতে পার!

আমি—

হ্যাঁ, শিউলী—আজ কেবল তোমারই বাঁচার প্রশ্ন নয়—তার চাইতেও বড় তোমার সন্তানের প্রশ্ন তোমার সামনে। অভিমান তোমার যতই থাক, সেই অভিমানে তোমার সন্তানের এত বড় অনিষ্ট তুমি করতে পারো না—

করবো—আমি সই করবো—দিন—

শিউলী ওকলাতনামায় সই করে দিলে।

২৭

সমস্ত আদালত গৃহ যেন আজ স্তব্ধ।

দর্শকের গ্যালারিতে লোক ঠাসাঠাসি। নতুন করে আজ চম্পাবাঈয়ের মামলা শুরু।

অপরাধীর কাঠগড়ায় চম্পাবাঈ।

কয়েকদিন হলো, সে যেন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ব্যারিস্টার নীলাদ্রি চৌধুরী সাক্ষীকে জেরা করছিল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হারাধন—

তোমার নাম হারাধন—

আজ্ঞে—

আচ্ছা হারাধন, তুমি আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছো, রাত প্রায় বারটায় তোমাকে চম্পাবাঈ ডেকে ঘুমের ঔষধ আনতে বলে—

আজ্ঞে—

ওষুধ নিয়ে তুমি ফিরে আস রাত দেড়টায়—

ঐ রকমই হবে—

কোন্ ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনেছিলে—মডার্ন ফার্মেসি তো—

হ্যাঁ—

ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছেই তো মডার্ন ফার্মেসি—

আজ্ঞে—

তা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে চারটে পাউডার মডার্ন ফার্মেসি থেকে আনতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগল—

তা লাগবে বইকি—

না-তা লাগতে পারে না—বড় জোর ঘণ্টাখানেক—এখন বল

ঐ বাকী সময়টা তুমি কি করছিলে ? কোথায় ছিলে ?

আমি তাহলে ডিস্‌পেনসারিতেই ছিলাম।

না ছিলে না—আমি বলছি, তুমি কি করেছিলে—কম্পাউণ্ডারবাবু মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই পাউডার করে দেয়, তুমি বেরিয়ে আস- রাত সাড়ে বারটা।

আজ্ঞে কি বলছেন আপনি ?

ঠিকই বলছি—তুমি ডিস্‌পেনসারি থেকে বের হয়ে আস যদি রাত সাড়ে বারটায়, তা রাত দেড়টা তোমার হলো কেন চম্পাবাঈকে পাউডারগুলো এনে দিতে—

আমি ডিস্‌পেনসারি থেকে বের হয়ে সোজা মার কাছেই চলে আসি -দেরি করিনি—

তুমি যে সোজা ডিস্‌পেনসারি থেকে চম্পাবাঈয়ের কাছে আসনি, তার প্রমাণ আছে—এবার আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও, হারাধন—কম্পাউণ্ডারবাবু যখন ভিতরে ওষুধ তৈরী করছিলেন, তুমি তখন কোথায় ছিলে ?

আজ্ঞে কাউণ্টারের ভিতরে—একটা টুলে বসেছিলাম—ওষুধ না নিয়ে তো আসতে পারি না—

ঘরের মধ্যে অন্যান্য ওষুধের আলমারির মধ্যে ছোট একটা আলমারিতে সব বিষ ওষুধ ছিল, জান তুমি। তুমি তো আগেও অনেকবার ঐ ডাক্তারখানায় গিয়েছো, নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছো—কারণ আলমারির গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী ও বাংলায় 'বিষ' কথাটা লেখা ছিল—

তা দেখেছি বইকি।

দেখেছো তাহলে।

দেখেছি—

কম্পাউণ্ডারবাবু সে-রাত্রে ঘুমের ওষুধ তৈরী করবার আগে ঐ আলমারি থেকে দুটো শিশি নিয়ে যাবার পর আলমারিটা খোলাই ছিল, তাই না ?

মনে নেই—

আচ্ছা এই শিশিটা চেনা ? চিনতে পারছো—কাগজে মোড়া একটা অ্যাট্রোপিনের শিশি বের করে দেখাল নীলাদ্রি হারাধনকে।

কিসের শিশি ওটা? হারাধন জিজ্ঞাসা করে।

এটার মধ্যে যে বিষ আছে, সেই বিষই আগরওয়ালাকে মদের সঙ্গে সে-রাত্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে তার মৃত্যু হয়। আর এই শিশিটা তুমিই সে-রাত্রে কম্পাউণ্ডারবাবু যখন ভিতরে ওষুধ তৈরী করতে ব্যস্ত, এর থেকে খানিকটা বিষাক্ত ওষুধ ঢেলে নিয়েছিলে—

কি যা-তা বলছেন, আজ্ঞে।

তুমি যে এই শিশিটায় হাত দিয়েছিলে, তার প্রমাণ আছে—নীলাদ্রি বলে।

প্রমাণ! কি প্রমাণ—হারাধন এতক্ষণে যেন কেমন একটু বিব্রত—গলার স্বরে দ্বিধা।

প্রমাণ এই শিশির গায়ে তোমার হাতের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে—কেবল তাই নয়, বিষের খাতার রেকর্ডে এর মধ্যে যতটুকু ওষুধ থাকা উচিত, তাও নেই—গ্রেণ কুড়ি কম আছে—

আজ্ঞে ও-সব আমি কিছু জানি না।

মিঃ লর্ড—লোকটা যে মিথ্যে বলছে, তার প্রমাণ দেবে আদালতে আমি যে সব exhibit দাখিল করেছি, তার মধ্যে poisonous drugs-এর record, ঐ শিশি ১নং ও ২নং exhibit আর পুলিসের সংগৃহীত finger print report অর্থাৎ আমার ৩নং exhibit।

নীলাদ্রি একটু থেমে আবার বকতে থাকে, মিঃ লর্ড। আমার ধারণা, সে-রাত্রে ঐ শিশি থেকে অ্যাট্রোপিন চুরি করে আরো চারটে পুরিয়া তৈরী করে হারাধন এবং সেই চারটে পুরিয়াই আসলে দিয়েছিল হারাধন চম্পাবাঈয়ের হাতে গিয়ে—এবং হারাধনকে কোথাও গিয়ে ঐ বিষ দিয়ে চারটে পাউডার তৈরী করতে হয়েছিল বলেই ওষুধ নিয়ে আসতে ওর অত দেরি হয়েছিল।

না, না—এসব মিথ্যে—বানানো কথা—চেঁচিয়ে ওঠে হারাধন।

না—মিথ্যে নয়—তাই সত্যি—আর চম্পাবাঈ বিষ দিয়েছিল, সেইটা প্রমাণ করবার জন্য পরে রাত্রে চম্পাবাঈ ঘুমোবার পর বিষের পাউডারগুলো সরিয়ে তিনটে ঘুমের পাউডার রেখে আসা হয়, তার দেরাজের উপরে—

না—না—না—দোহাই ধর্মাবতার, এসব মিথ্যে—মিথ্যে—

হারাধন আবার চেঁচিয়ে ওঠে।

এবার আমি আবার আমার দ্বিতীয় সাক্ষী ডাঃ অধিকারীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে বলছি—

ডাঃ অধিকারী এসে দাঁড়ালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

ডাঃ অধিকারী -

বলুন!

অ্যাট্রোপিনের লিথ্যাল ডোজ কত হতে পারে?

দু' গ্রেন থেকে আড়াই গ্রেন—

That's all! It is to be noted, Me Lord!

আদালত কক্ষে রীতিমত যেন একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়। হারাধনকে পুলিস কাস্টডিতে রাখা হয় নীলাদ্রির ইচ্ছাক্রমে জজসাহেবের নির্দেশে। পরের দিন আবার জেরা শুরু হয় আদালতে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দ্বিজেন পাড়ুই কমপাউণ্ডার।

পাড়ুই, ঐ হারাধনকে কতদিন তুমি চিনতে?

তা অনেকদিন—একই গ্রামে বাড়ি আমাদের।

হারাধন কতদূর লেখাপড়া জানে?

আজ্ঞে, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল—

চম্পাবাঈয়ের ওখানে কাজ করার আগে ও কোথায় কাজ করত, জান কিছু?

আজ্ঞে, জানি বইকি—ওই মডার্ন ফার্মেসিতেই কাজ করতো—প্রায় বছর খানেক—

সে-চাকরি ও ছেড়ে দিয়েছিল?

না—মডার্ন ফার্মেসির কর্তা ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

কেন—

ওষুধ চুরি করে বিক্রি করতো তাই।

That's all—এবার আমার চতুর্থ সাক্ষী রাসমণিকে কাঠগড়ায় আনা হোক।

রাসমণি এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

তোমার নাম রাসমণি?

আজ্ঞে হুজুর।

ঐ হারাধনকে তুমি চেন?

চিনবো না—অলপ্পেয়ে হাড়হাভাতে শয়তান মিন্‌সে।

হারাধনের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ- সত্যি কথা বলো, এবং কতদিনের ঘনিষ্ঠতা?

ঐ বাড়িতে কাজ করতে এসে—বছর তিনেক হবে—

হারাধনকে আগে তুমি চিনতে না?

চিনতাম।

চিনতে? কি করে চিনলে?

এক গাঁয়ে বাড়ি যে আমাদের।

যে রাত্রে লোকটা মারা যায়, সে-রাত্রে কখন হারাধন গিয়েছিল ওষুধ নিয়ে?

তা ঘণ্টা দেড়েক হবে।

কে ওষুধ দেয় চম্পাবাঈকে, তুমি না হারাধন—

ঐ মিন্‌সে—

রাত্রে চম্পাবাঈ শোবার পর তুমি কি করলে?

নীচে গিয়ে শুয়ে পড়লাম—

তারপর?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধহয়, হঠাৎ হারাধনের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। ও আমার হাতে তিনটি পুরিয়া দিয়ে বলে—সেই পুরিয়াগুলো বাঈজীর ঘরে রেখে বাঈজীর ঘরের পুরিয়াগুলো চটপট নিয়ে আসতে—

এনেছিলে তুমি?

হ্যাঁ—

Me Lord! that point is to be noted! আচ্ছা রাসমণি —এবার আদালতকে বল—সে-রাত্রে আগরওয়ালার টাকার ব্যাগটা হারাধনের হাতে কি তুমি দেখেছিলে?

হ্যাঁ হুজুর—

হারাধন চেঁচিয়ে ওঠে—ও হারামজাদী মাগী মিথ্যে কথা বলছে হুজুর—

মিথ্যে, রাসমণি চেঁচিয়ে ওঠে, অনামুখো মিন্‌সে মিথ্যে বলছি —ভাব, জানি না কিছু—দেখিনি তোমায় আমি ব্যাগটা ছুরি দিয়ে কেটে সব টাকা বের করে নিতে—

হারামজাদী শয়তানী—তোকে আমি খুন করবো—হারাধন আবার চেঁচিয়ে ওঠে—

খুন করবি—আয় না খুন কর—

একটা গোলমাল শোনা যায় আদালতে। জজ সাহেব বলে ওঠেন—

Order! Order!

প্রসিকিউশন কাউন্সেল ঐ সময় বলে ওঠে, এসব কথা তুমি আগে আদালতে জানাওনি কেন?

ওই মিনসে তাহলে আমায় খুন করবে বলেছিল—তাছাড়া ও বলেছিল, আমায় বিয়ে করে ঘর বাঁধবে।

আদালতে একটা হাসির রোল ওঠে।

রাসমণি বলতে থাকে, তখন কি জানি—ও মিনসে দমবাজ—মিথ্যুক অলপ্পেয়ে ড্যাকরা—

নীলাদ্রি বলতে থাকে, Me Lord! এটা ঠিকই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে সে-রাত্রে অসুস্থ, ক্লান্ত চম্পাবাঈ মাতাল বদ্রী-প্রসাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ঘুমের ওষুধ তার মদের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল—এবং ঘুমের ওষুধ হাতের কাছে না থাকায় হারাধনকে বলে ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসতে—ডিসপেনসারি থেকে হারাধন তাকে যে পুরিয়াগুলো এনে দেয় তারই একটা পুরিয়া মদের সঙ্গে সে মিশিয়ে দেয়—এবং সে পুরিয়ার ওষুধ মেশানো মদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বদ্রীপ্রসাদের মৃত্যু হয়—কিন্তু সে বিষ হতভাগিনী চম্পাবাঈ বদ্রীপ্রসাদের মদের গ্লাসে মিশিয়ে দিলেও সেটা যে তীব্র বিষ, তা না জেনেই সে দিয়েছিল—এবং আদালতে এও প্রমাণ হয়েছে রাসমণির সাক্ষ্য ও অন্যান্য exhibits থেকে যে সে বিষ সংগ্রহ করেছিল হারাধনই সে-রাত্রে—বদ্রীপ্রসাদের ঐ টাকাগুলো হাতাবার লোভে।

প্রসিকিউশন কাউন্সেল ঐ সময় বলেন, কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যে চম্পাবাঈয়ের মত এক জঘন্য চরিত্রের বারনারীর আদৌ হাত ছিল না, তারই বা প্রমাণ কি?

আমার মাননীয় বন্ধুকে সে প্রমাণও অবশ্যই আমি দেবো বৈকি—কিন্তু তার আগে ঐ চম্পাবাঈ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই—

দুর্ভাগ্য মানুষকে এক এক সময় কোথায় যে কোন্ অন্ধকার অতলে টেনে নিয়ে যায়—তার সব কিছুকে গ্রাস করে—তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ঐ চম্পাবাঈ। আসামীর কাঠগড়ার হত্যাপরাধে ঐ যে দাঁড়িয়ে মেয়েটি—

আদালত যেন একেবারে স্তব্ধ।

ছুঁচপতনের শব্দটুকুও বুঝি শোনা যাবে কান পাতলে।

নীলাদ্রি বলতে থাকে—

চম্পাবাঈ—ওর আসল নাম শিউলী—ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়ে ও সৌদামিনী দেবী নামে এক সহৃদয়া ভদ্রমহিলার আশ্রয়ে মানুষ হয়। When she was an innocent girl of seventeen or eighteen only, সেই সময় একটি উচ্ছৃংখল ধনী ঘরের যুবক ওর জীবনের পথে এসে দাঁড়ায়, and who convinced her that he loved her and would marry her.

হঠাৎ অপরাধীর কঠগড়া থেকে চেঁচিয়ে ওঠে চম্পাবাঈ, না, না —সব মিথ্যা, সব মিথ্যা—আমার নাম কোন দিনও শিউলী ছিল না —আমার নাম চম্পাবাঈ—নর্তকী বাঈজী বেশ্যা আমি, চম্পা –

না—তোমার আসল ও সত্যি নাম শিউলী—শিউলী চৌধুরী— প্রতিবাদ জানায় নীলাদ্রি এবং এও সত্যি, yes Me Lord, সেই উচ্ছৃংখল যুবকের প্রতারণা ও নীচতাই একদিন ঐ হতভাগিনীকে ওর এই বর্তমান জীবনে টেনে এনেছে—

না, না, না—আমি জন্ম থেকেই নর্তকী বাঈজী—কাউকে আমি চিনি না—কারো সঙ্গে কোন দিন আমার পরিচয় ছিল না—সব—সব —মিথ্যা—

২৮

নীলাদ্রি বলতে থাকে—

মি লর্ড, আমি প্রমাণ করবো, ছিল—this poor girl is still trying to save that man—যে ওর জীবনের সমস্ত সর্বনাশ লজ্জা ও অপমানের কারণ—এবং আমি তাকে চিনি—যাই হোক যা বলছিলাম—সেই যুবক বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওকে ভোগ করবার পর ওকে একদিন ফেলে পালায় তার তৃষ্ণা মিটে যেতেই—তারপর

দীর্ঘ বার বছর কোন সংবাদই সে আর রাখেনি—রাখবার প্রয়োজনও অবিশ্যি বোধ করেনি। আর ইহজীবনেও বোধহয় সে করতোও না, যদি না চম্পাবাঈকে আজ হত্যার অপরাধে ঐ কাঠগড়ায় এসে বার বছর পরে দাঁড়াতে সে দেখতে পেত।

জজ বাধা দিলেন, If you have got anything relevant to say about that girl in connection with this case. সেই কথাই বলুন—

সেই কথাই বলবো এবারে। চম্পাবাঈ লোকের চোখে, সমাজের চোখে নর্তকী ও বাঈজী হলেও সে ঠিক ঐ শ্রেণীর নয়—এবং জীবন ধারণের জন্য নেহাত অনন্যোপায় হয়েই ওকে নাচ-গান করতে হয়েছে—কোন দিনই তার পক্ষে একজন নিরীহ ব্যক্তিকে বিষ দিয়ে হত্যা করা—সম্ভব নয়—ঘটনাচক্রে সে হত্যার মামলায় জড়িয়ে পড়েছে—দুর্ভাগ্য ওর। তবে তারও আগে আদালতকে জানাতে চাই আমি, সে-রাত্রে কি হয়েছিল। তাই আমার ২নং সাক্ষী এবারে দরোয়ান কিষেণনালকে ডাকা হোক—

কিষেণলাল কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল কাঠগড়ায়।

কিষেণলাল তোমার নাম? নীলাদ্রি শুধোয়।

জী!

দেখো, ইয়ে আদালত হ্যায়—আদলেতকা সামনামে সাচ্ সাচ্ বাতাও—ওহি রাতমে কিতনি বাজে হারাধন ফির ওয়াপস আয়া দাবাই লেকর—

জী সাড়ে বারা বাজে করিবন—

আতেহি উসনে উপর চলা গিয়া—

নেহি—বগলওয়ালা কামরা মে ঘুসা—দশ পনরো মিনিট বাদ উপর গিয়া।

কিষেণলাল, আভি বাতাও—ঐহি রাত মে—তুম আউর কুছ দেখা থা? নীলাদ্রি প্রশ্ন করে।

জী—

কেয়া দেখা তুম্‌নে!

রাত উসবখত দো সোয়া দো হোগী—বগলওয়ালা কামরামে—যিসমে হারাধন রতা থা—রাসমণি ভি ওহি কামরামে আয়ি—

হারাধন আউর রাসমণিকে রুপায়াকো বারে ম্যায় নে বাত্ চিৎ শুনা —হাম বগলওয়ালা কামরামে চুপচাপ শো গিয়া—

উস্‌কি বাদ !

হামনে দেখা বহুৎ রুপেয়াকা নোট—হারাধন একঠো গাটরি মে বাঁধতা আর রাসমণি সামনামে খাড়ি হ্যায়—হ্যাম ত স্রিফ্ তাজ্জব বন্‌গিয়া—ওৎনা রুপেয়া উসকো কিধার সে মিলা—হাম কামরামে ঘুস্ গিয়া—উয়ো দোনে হামে দেখ্‌কার চম্‌ক উঠি—

উস্‌কি বাদ ?

হারাধন হামকো চারশো রুপেয়া দিয়া আউর বোলা কোই কিসিকো রুপেয়াকো বারেমে বাতানে সে উয়ো হামে জানসে মার ডালেগা—সরকার ইস্‌মে হামারো কোই কসুর নেহি হ্যায়—স্রিফ্ জানকি ডরসে—হাম চুপচাপ হো গিয়া—

That's all, my Lord ! এবারে আমি সে-রাত্রে ঠিক কি ঘটেছিল, ঘটনার যে চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল সেই রাসমণিকে আবার আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আদালতকে -

রাসমণি আদালতের নির্দেশে আবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল।

রাসমণি এবারে তুমি আদালতের সকলের সামনে বল সে-রাত্রে কি হয়েছিল।

হুজুর -দোহাই ধর্মের ! আজ আমি সব সত্যি বলবো। রাত তখন প্রায় পৌনে এগারটা হবে বদ্রীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে যে বাবুটি এসেছিলেন তিনি চলে গেলেন—কিন্তু বদ্রীপ্রসাদ গেল না।

বদ্রীপ্রসাদ সে-রাত্রে খুব মদ খেয়েছিল তাই না ! নীলাদ্রি প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ হুজুর—বাঈজীর দেহটা ইদানীং আদপেই ভাল যেত না —পেটের ব্যথায় প্রায়ই কাতরাতো—বিছানায় শুয়ে থাকত। আগের দিনও পেটের ব্যথায় সারাটি দিন বিছানায় শুয়ে ছিল।

তারপর ?

সে-রাত্রে বদ্রীপ্রসাদের বন্ধু সমীরণবাবু চলে যাবার পর একসময় রাসমণির নজরে পড়ে, হারাধন দরজার ফাঁক দিয়ে কি যেন দেখছে

চম্পাবাঈয়ের ঘরে, রাসমণিও অন্য একটা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে দেখছিল।

চম্পাবাঈ গাইছিল—

বদ্রীপ্রসাদ ব্যাগটা খুলে দেখায়—দেখো পিয়ারী, বহুৎ বহুৎ রুপেয়া হ্যায় হামারা পাস—মেরে জান, মেরে লায়লী, সব কুছু তেরে লিয়ে - নাচো গাও—

গান শেষ হতে পরিশ্রান্ত চম্পা বলে, বহুৎ পরেশম হ্যায় বাবুজী—মেরা তবিয়ৎ ভি আচ্ছা নেহি হ্যায়—আজ মুঝে ছোড় দিজিয়ে—

নেহি নেহি—

বদ্রীপ্রসাদ বার বার বলতে থাকে, গাও—গাও—

রাত বহুৎ হো গেয়ি বাবুজী—

যানে দো—ইয়ে রাত ফির না আয়েগী চম্পাবাঈ—গাও—নাচো—

থোড়া বৈঠিয়ে, আভি ম্যায় আতি হু—

চম্পা উঠে পড়ে—

হারাধন চট্ করে সরে যায় - চম্পা ঘরে ঢুকে ঘুমের ওষুধ খোঁজে, নেই—তখন সে হারাধনকে ডেকে বলে, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে আনতে। হারাধনকে পাঠিয়ে দিয়ে চম্পাবাঈ আবার ঘরে ফিরে যায়।

ফের গান শুরু করে—

তারপর? নীলাদ্রি শুধায়।

রাসমণি বলতে থাকে, হারাধন এক সময় ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো।

তুমি তখন কোথায় ছিলে?

উপরের বারান্দায়।

তারপর কি হলো?

আমাকে হারাধন বললে বাঈজীকে ডেকে আনতে। আমি গিয়ে ঘরে ঢুকে বাঈজীকে ইশারায় ডেকে নিয়ে এলাম।

বাঈজী হারাধনকে শুধায়, কিরে এনেছিস?

হ্যাঁ মা—এই যে!

হারাধন চারটে পুরিয়া চম্পাবাঈজীর হাতে দেয়।

তারপর—

বাঈজী হারাধনকে বিদায় দিয়ে পুরিয়া থেকে একটা নিয়ে বাকী তিনটে পুরিয়া শোবার ঘরে দেরাজের উপরে একটা কৌটোর মধ্যে রেখে পাশের ঘরে ফিরে গেল।

তারপর ?

আমি আর হারাধন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকি।

বলে যাও—

চম্পাবাঈ ঘরে ফিরে আবার গান শুরু করে। লোকটা তখন বেহেড মাতাল।

গান গাইতে গাইতেই এক ফাঁকে কৌশলে চম্পাবাঈ হাতের পুরিয়াটার সব ওষুধ গ্লাসে ঢেলে দেয়—একটু পরেই সেই গ্লাস থেকে মদ খেয়ে লোকটা শুয়ে পড়ে শয্যায়—

শুয়ে পড়ল ?

হ্যাঁ, বাঈজী তখন লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে গান বন্ধ করে ঘর থেকে উঠে আসে নিজের শোয়ার ঘরে।

তারপর—

তারপর আমাকে ডেকে বলে, লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে, আমারও ভীষণ ঘুম পেয়েছে—তোরা শুতে যা। চলে গেলাম আমি নিজের ঘরে।

কিন্তু ঘুম এলো না আমার চোখে।

কেন ?

হারুর চোখে আমি যেন সে-রাত্রে কেমন দৃষ্টি দেখেছিলাম। মনের মধ্যে একটা সন্দেহের কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছিল—এক সময় উঠে পড়ে উপরে গেলাম, সেই ঘরে ঢুকে দেখি হারু ঝুঁকে পড়ে ঘুমন্ত বাবুটিকে পরীক্ষা করছে—হাতে তার সেই লোকটার টাকার ব্যাগটা।

হারাধন আবার চেঁচিয়ে ওঠে, মিথ্যে। হুজুর, সব মিথ্যে—ও আমাকে ফাঁসাবার মতলবে ঐ সব বলছে—

রাসমণি বলে ওঠে, না হুজুর এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

নীলাদ্রি বলে, বল, তারপর তুমি কি করলে ?

আমি ডাকলাম, হারু—

হারাধন চম্‌কে ওঠে—কে ?

কি করছিস ? রাসমণি বলে।

চুপ ! কথা বলিস না। চল এ-ঘর থেকে।

কোথায় ?

নীচে।

ব্যাগটা নিচ্ছিস কেন ?

অনেক টাকা আছে এতে। চল তাড়াতাড়ি।

কিন্তু কাল সকালে লোকটা যখন টাকার ব্যাগ খোঁজ করবে—তোকে আর আমাকেই লোকে সন্দেহ করবে—

কচু করবে—আর চাইবে কে। ও তো মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

সে কি ?

হ্যাঁ—

কি করে মরল ?

বিষে—কাল এসে পুলিসের লোক আমাদের ধরবে না—ধরবে বাঈজীকে। তারা ধারণা করবে, টাকার লোভে বাঈজী ওকে বিষ দিয়ে মেরেছে—চল—নীচে চল—শীগ্‌গিরি—চল, নীচে চল।

তারপর ? নীলাদ্রি শুধায়।

দু'জনে নীচে গেলাম—রাসমণি বলতে থাকে—ব্যাগ কেটে টাকা বের করে হারু যখন গুনছে, দরোয়ান এসে ঘরে ঢোকে। তখন হঠাৎ হাবু দরোয়ানকে কিছু টাকা দিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়ে বিদায় করে।

দরোয়ানটা ভীতু মানুষ—হারাধনের কাছ থেকে টাকা পেয়ে ভয়ে সুড়সুড় করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

তারপর হারাধন কি করল ?

হারাধন তখন পকেট থেকে তিনটে পুরিয়া বের করে আমাকে বলে, যা—চট্‌পট্‌ উপরে চলে যা—বাঈজী ঘুমোচ্ছে—বাঈজীর দেরাজের উপর যে-তিনটে পুরিয়া আছে—সে-তিনটে নিয়ে আয় এই তিনটে রেখে। হুজুর ধর্মাবতার যেমন যেমন ও বলেছে, আমি করেছি—তখন কি জানি, অলপ্পেয়ে মিন্‌সে বাঈজীর হাতে চারটে বিষের পুরিয়া দিয়েছিল। হুজুর ঐ শয়তানটার নিশ্চয়ই বাঈজী-কেও মারবার ইচ্ছা ছিল সে-রাত্রে—ভাগ্যে বাঈজী সে-রাত্রে ঘুমের

ওষুধ খায়নি—ধর্মাবতার, ঐ মিন্‌সেই বাবুটিকে বিষ দিয়ে টাকার জন্য খুন করেছিল—বাঈজী কিছু জানে না—সে নির্দোষ—

সমস্ত আদালত একেবারে স্তব্ধ।

নীলাদ্রি এবার বলতে শুরু করে—

Me Lord and gentlemen of the jury, গত কয়দিনের রাসমণি, কিষেণলাল, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতির সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে how tactfully হারাধন বদ্রীপ্রসাদের টাকাগুলো সে-রাত্রে আত্মসাৎ করবার জন্যে poor চম্পাবাঈয়ের হাতে ঘুমের ওষুধের বদলে বিষের পুরিয়াগুলো তুলে দিয়েছিল এবং মদের সঙ্গে সেই বিষ পান করে কিভাবে বদ্রীপ্রসাদের মৃত্যু হয়—এবং ঘটনাচক্রে হত্যার অপরাধ কি করে ঐ সম্পূর্ণ নির্দোষ চম্পাবাঈয়ের উপরে এসে পড়ে—এবং ওকে ঐ কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়। একটু থামল নীলাদ্রি—

Really it is irony of fate—একদিন যার কোন উচ্চবংশের ঘরণী হবার কথা, আজ সে কিনা হত্যার অপরাধে ঐ কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু কেন এমনটা ঘটল—

আদালত নির্বাক।

নীলাদ্রি আবার বলে, ও যে এমনি করে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কলঙ্কের সঙ্গে লজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল তার মূলে কে, জানেন—প্রথমেই আদালতকে বলেছি, আমি তার মূলে—এক ধনী যুবক এক অপরিণামদর্শী ধনীর দুলাল who brutally seduced her, spoiled her—আর সেই সে-দিনকার শিউলীই আমাদের ঐ চম্পাবাঈ—

But—who—who was that young man—প্রসিকিউশন কাউন্‌সেল বলেন, আমার মাননীয় বন্ধু defence কাউন্‌সেল মিঃ চৌধুরী বলবেন কি—কেমন করে ওই চম্পাবাঈয়ের ইতিহাস তিনি জানতে পারলেন, না—চম্পাবাঈয়ের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য ওর সম্পর্কে একটি মনোহর কাহিনী রচনা করে—

No my Lord, নীলাদ্রি বলল, মনোহর কাহিনী নয়—It's a fact, truth—কারণ সেদিনকার সে-যুবক আর কেউ নয়—yes—আপনাদের সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আজকের ব্যারিস্টার এই নীলাদ্রি

চৌধুরী—yes I—I am the man. নির্দোষ—সম্পূর্ণ নির্দোষ ঐ চম্পাবাঈ নয়, শিউলী চৌধুরী। Yes—she is my marrieed and legal wife—

হঠাৎ একটা শব্দ হলো—টুল থেকে পড়ে গিয়েছে চম্পাবাঈ অজ্ঞান হয়ে।

ছুটে গেল সবাই কাঠগড়ায়—একটু পরেই অ্যামবুলেন্স ডেকে শিউলীকে পুলিস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

২৯

জ্ঞান ফিরে এলো বটে শিউলীর কিন্তু সে বড় দুর্বল—ক্ষীণ—

নীলাদ্রি হাসপাতালে টেলিফোন করে দিয়েছিল, যেন তার স্ত্রীর চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয়। যা অর্থ লাগে, সে দেবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা নীলাদ্রি হাসপাতালে এল। অন্য এক মানুষ।

নিঃশব্দে এসে শিউলীর কেবিনে ঢুকে তার শয্যার পাশটিতে দাঁড়াল, শিউলী—

চোখ মেলে তাকাল শিউলী সে-ডাকে।

আমি এসেছি, শিউলী—

কে আপনি?

চিনতে পারছো না আমায় শিউলী—আমি—আমি—নীলাদ্রি—

নীলাদ্রি—

হ্যাঁ—

কেন এসেছেন আপনি—কি চান—

আমায় ক্ষমা কর, শিউলী—

ক্ষমা—ক্ষমা কিসের—আপনি কি অপরাধ করলেন যে ক্ষমা চাইছেন—

করেছি—অপরিসীম অপরাধ করেছি—

না, আপনি কিছু করেননি—আপনি দয়া করে এখান থেকে যান—

আমি আমার স্ত্রীকে—আমার সন্তানকে যে নিয়ে যেতে এসেছি—

আপনার স্ত্রী—আপনার সন্তান—

হ্যাঁ আমার স্ত্রী—আমার সন্তান—কোথায়, কোথায় সে বল ?

আপনার সন্তান কোথায়, তা আমি কি করে জানব ?

তোমার আমার সন্তান—বল, বল সে কোথায় ?

আপনার কোন সন্তান থাকলেও আমি কিছু জানি না।

জান তুমি—শিউলী, বল, বল—কোথায় সে ?

জানি না—

শিউলী।

না, না—যান এখান থেকে—যান বলছি—আপনাকে আমি চিনি না, জানি না—উত্তেজিত হয়ে ওঠে শিউলী, হাঁপাতে থাকে।

ডাক্তার ইশারা করেন নীলাদ্রিকে, চলে যেতে—

কিন্তু পরের দিন আবার যায় নীলাদ্রি—

শিউলী, বল—বল আমার সন্তান কোথায়—নীলাদ্রি অনুরোধ জানায় আবার।

কেন—কেন আবার এসেছেন—বলেছি তো, আমি কিছু জানি না—আপনাকে আমি চিনি না।

দয়া করো শিউলী, বল—

না—না—

শিউলী, জানি আমার অপরাধের সীমা নেই—ক্ষমা নেই—তবু—তবু ক্ষমা চাইছি—বল, আমার সন্তান কোথায়—

আজ সন্তানের খোঁজ নিতে তুমি এসেছো—কিন্তু সেদিন—যখন আসবো বলে আশ্বাস দিয়ে এক অভাগিনী নারীর সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে চলে গিয়েছিলে, তখন তো সে-সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয়নি তোমার—

শিউলী, বিশ্বাস করো, আজ তারই অনুতাপের আগুন সর্বক্ষণ আমাকে পুড়িয়ে মারছে—

অনুতাপ—অনুতাপের আগুন, কিন্তু কেন বল তো—অনুতাপ বলে যদি কিছু থাকে, সে তো আমাদের মত সর্বহারা লাঞ্ছিতাদের জন্যে—তোমরা অনুতাপ করতে যাবে কেন ?

সবই আমার প্রাপ্য—কিছুই বলবার নেই আমার—দয়া করে শুধু বল, কোথায় আমার সেই সন্তান—

সন্তান—আজ তোমার সন্তানের জন্যে ছুটে এসেছো তুমি—অথচ সেদিন যখন সেই কথাটাই একটিবার তোমায় জানাবার জন্যে একজন ঝড়-জল-বৃষ্টি মাথায় করে পাগলের মত দীর্ঘ আড়াই মাইল পথ ছুটে গিয়েছিল, তখন তো কামরার মধ্যে বসে পরম নিশ্চিন্তে বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছিলে—বার বার তোমায় চিৎকার করে ডেকেছিল সে কিন্তু কানে তোমার সে চিৎকার পেঁছাল না—

সে-অবহেলা, সে-অপরাধের ক্ষমা নেই, আমি জানি—কিন্তু সেদিন যে নীলাদ্রিকে তুমি জানতে, আর আজ যে নীলাদ্রি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, বিশ্বাস করো, তারা এক নয়—আজ তোমার কাছে এসেছে তোমার সন্তানের জন্মদাতা—

না, না—তোমার সন্তান নয়, তোমার সন্তান নেই—কোন দিন হয়নি, কোন দিন ছিলও না—

শিউলী—বল শিউলী, কোথায় সে—

বলবো না—কিছুতেই বলবো না। সে তোমার কেউ নয়—তুমি তার কেউ নও—সে জানে, তার বাপ নেই, মৃত—তুমি তার কাছে মৃত, মৃত—

উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভেঙে পড়ে শিউলী জ্ঞান হারায়।

নীলাদ্রি চিৎকার করে ওঠে—বাইরে গিয়ে।

ডাক্তার, শীগ্গির আসুন—patient unconscious হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার ছুটে আসেন নীলাদ্রির ডাকে।

তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দেন শিউলীকে।

ডাক্তার নীলাদ্রিকে চলে যেতে বলেন।

নীলাদ্রি ক্লান্ত শিথিল পায়ে শিউলীর কেবিন থেকে বের হয়ে আসে।

কেবিনের দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল পরাশর মিত্র—

মিঃ চৌধুরী—

কে! পরাশরবাবু—আপনি আমার নিশ্চয়ই এ ক'দিন অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু আমি জানি, আমার সব কথা আপনি এখনো জানতে পারেননি—Come to my house to-night. সব বলবো—সব জানতে পারবেন আমার কথা। আজকের নীলাদ্রি

চৌধুরীর মুখোশটা খুলে দিতে পারবেন—

যাবো আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-জন্য নয়—কোন খবরের জন্য নয়—

তবে কেন যাবেন।

আপনাকে আমার নমস্কার জানাতে—

কেন! নমস্কার কেন! বোকার মতই যেন তাকায় নীলাদ্রি পরাশরের মুখের দিকে?

নিশ্চয়ই, আপনার মত মানুষকে যদি নমস্কার না জানাতে পারি আজ, তবে এতদিন কী সংবাদপত্রের রিপোর্টারী করলাম—

আমার সব কথা আপনি এখনো কাগজে আপনার লেখেননি!

না লিখিনি এখনো, তবে লিখবো—আজ রাত জেগে লিখতে হবে সব কথা যাতে কাল সকালের কাগজে সবাই পড়তে পরে—আচ্ছা আসি—Good night!

পরাশর চলে গেল। নীলাদ্রি দাঁড়িয়েই থাকে তেমনি।

তনিমা কখন এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি।

তনিমা ডাকে, নীলাদ্রিবাবু!

কে! ও তনিমা—

চলুন—বাড়ি যাবেন না।

বাড়ি!

হ্যাঁ—

চল—

দু'জনে এসে গাড়িতেই উঠে বসল। নীলাদ্রিকে বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে তনিমা বললে, আপনার গাড়িটা নিয়ে আমি একটু বেরুচ্ছি—

কোথায়?

পরে বলব।

নীলাদ্রি আর কোন কথা বলে না। তনিমা গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

৩০

চারদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

ড্রাইভার শুধায়, কোথায় যাবো দিদিমণি?

গাড়িতে পেট্রল আছে?

আছে।

চল, কৃষ্ণনগর।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়।

রাত সোয়া নটা নাগাদ কৃষ্ণনগর পৌঁছে আনুসন্ধান নিয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়।

বাড়ির গেটে নেম প্লেট্—নার্স—মিসেস মালতী বসু।

কড়া নাড়তেই ছোট ন-দশ বছরের একটি বালিকা এসে দরজা খুলে দেয়, কাকে চান?

এটা নার্স মিসেস বসুর বাড়ি?

হ্যাঁ—

তুমি কে?

আমি তার মেয়ে।

কি নাম তোমার?

রাণু বসু—

বাঃ সুন্দর নাম। মা আছেন তোমার?

হ্যাঁ, মার জ্বর আজ দু'দিন থেকে—বিছানায় শুয়ে আছেন—

তাকে একটু বলবে রাণু, কলকাতা থেকে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

কে রে রাণু, ভিতর থেকে ঐ সময় সাড়া আসে মহিলাকণ্ঠে।

একজন কলকাতা থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মা।

ভিতরে নিয়ে এসো—

রাণু বললে, আসুন ভিতরে—

মাঝারী গোছের একটি শোবার ঘর। পাশাপাশি দু'টি খাটে শয্যা বিছানো। একটিতে এক মধ্যবয়সী মহিলা শুয়ে।

নমস্কার—তনিমা বলে।

বসুন—নমস্কার—কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না।

না চিনবেন না—আমি—আমি আসছি শিউলীর কাছ থেকে—বুঝতে পারছেন বোধ হয়, তার কাছ থেকেই আপনার সব কথা ও ঠিকানা আমি জেনেছি।

ও—তার বিচারের কি হলো, জানেন কিছু—

সে মুক্তি পেয়েছে—

সত্যি !

হ্যাঁ—তবে সে খুব অসুস্থ—হাসপাতালে। আপনার সঙ্গে নিভৃতে কিছু আমার অত্যন্ত জরুরী কথা ছিল—

মালতী দেবী রাণুকে পাশের ঘরে যেতে বলেন, রাণু চলে যায়—

বলুন, কি বলছিলেন—মালতী বললে।

তনিমা নীলাদ্রি ও শিউলীর কথা আদ্যোপান্ত বলে যায়। স্তব্ধ হয়ে শোনেন মালতী দেবী।

আশ্চর্য !

সত্যিই আশ্চর্য—তনিমা বলে। তারপর একটু থেমে আবার বলে, ঐ রাণুই বোধ হয় শিউলীর সেই সন্তান।

হ্যাঁ—

রাণুকে আমি নিয়ে যেতে চাই—

রাণু এখনো তার মা-বাবার কথা কিছুই জানে না।

কিন্তু আপনি তো বুঝতে পারছেন, নীলাদ্রি তার সন্তানকে চায়—তার সত্য পরিচয়ে।

মালতী দেবী কি ভেবে মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, রাণু—

রানু ঘরে এলো, ডাকছিলে মা ?

হ্যাঁ—তোমার বাবা কে, তুমি অনেক দিন জিজ্ঞাসা করেছে তাই না ?

কোথায় আমার বাবা ?

তোমার বাবাকে দেখবে ?

হ্যাঁ—

কলকাতায় আছেন তোমার বাবা—তাহলে তুমি ওঁর সঙ্গে যাও—

কার সঙ্গে ?

তনিমাকে দেখিয়ে মালতী বলে, ওঁর সঙ্গে।

কখন যাবো, এখুনি ?

এখুনি। কিন্তু তোমার যে জ্বর—

আমার জন্য তুমি ভেবো না—জ্বর ভাল হলেই কলকাতায় গিয়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

তনিমা সেই রাত্রেই আবার রাণুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

সারাটা রাত নীলাদ্রি তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায়—

ভোর হতেই ডাক্তারকে নার্সিং হোমে ফোন করে, শিউলী কেমন আছে জানবার জন্য।

ডাক্তার বলেন, এখন অনেকটা ভাল—তবে খুব দুর্বল। Condition অত্যন্ত low—

আমি কি একবার বিকেলে যেতে পারি—

আসতে পারেন—তবে কোন রকম excitement রোগিনীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, মনে রাখবেন।

সারাটা দিন নীলাদ্রি মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। অতঃপর একবার ভাবে, সে যাবে। আবার ভাবে না, যদি শিউলীর অবস্থার আরও অবনতি হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বের হয়ে পড়ে—

নার্সিং হোমে পৌঁছে ধীরে ধীরে এক সময় শিউলীর কেবিনে প্রবেশ করে।

শিউলী চোখ বুজে পড়ে ছিল বেডে।

নীলাদ্রি কোন কথা বলে না, শয্যার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় শিউলী চোখ খোলে—সামনেই নীলাদ্রিকে দেখে সে আবার চোখ বুজে ফেলে।

শিউলী—নীলাদ্রি মৃদুকণ্ঠে ডাকে।

শিউলী কোন সাড়া দেয় না।

তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো তবু এসেছি—একবার বল—আমার সন্তান কোথায়?

শিউলী নীরব। জবাব দেবে না, শিউলী।

কেন বার বার বিরক্ত করছো—বলছি তো, তোমার কোন সন্তান জন্মায়নি—

ঠিক ঐ সময় তনিমা এসে ঘরে ঢুকল রানুর হাত ধরে।

তনিমা ডাকল, শিউলী—

শিউলী চোখ মেলে তাকাল।

এই দেখো, কাকে এনেছি—

শিউলী চেয়ে থাকে রানুর দিকে। চোখের দৃষ্টি তার অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আসে।

রাণু—ঐ তোমার মা—তনিমা শিউলীকে দেখিয়ে দেয়।

আমার মা—

হ্যাঁ—যাও, ওর কাছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় রাণু বেডের কাছে। মা—রাণু ডাকে।

শিউলী দু'হাত বাড়ায়—

রানু আরো এগিয়ে যেতেই শীর্ণ কম্পিত দু'টি হাতে বুকের নেয় রানুকে, রাণু—

শিউলী কাঁপছে। আমার রাণু—

মা—

রাণু—

শিউলী নীলাদ্রিকে দেখিয়ে বলে, যাও—রাণু, ওর কাছে যাও—

উনি কে, মা—

নীলাদ্রি দু হাতে রাণুকে বুকে টেনে নিয়ে আবেগকম্পিত স্বরে বলে, আমি তোমার বাবা, রাণু—

বাবা—

হ্যাঁ—তোমার বাবা। নীলাদ্রি বলে।

হঠাৎ ঐ সময় শিউলীর মাথাটা বালিশের পাশে গড়িয়ে পড়ে—

তনিমা চেঁচিয়ে উঠে, শিউলী—

নীলাদ্রি চেঁচিয়ে ডাকে, শিউলী—

শিউলীর কোন সাড়া পাওয়া যায় না—শুধু চেয়ে থাকে সে নীলাদ্রির মুখের দিকে।

নীলাদ্রি দু হাতে শিউলীর মাথাটা তুলে ধরে, শিউলী—শিউলী—

নী-লা-দ্রি—

শেষ